প্রথম প্রকাশ :: বুদ্ধ-পূর্ণিমা— ১৩৬১

পরিবেশক : সিগনেট বুকশপ
১২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট ॥ ১৪২-১ রাসবিহারী এভিনিউ

প্রকাশক
সরোজ মিত্র
৭।১, চন্দ্র চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলিকাতা-২৫

প্রচ্ছদপট এঁকেছেন
অচ্যুত চট্টোপাধ্যায়

ছেপেছেন
তড়িৎ চট্টোপাধ্যায়
চন্দ্রনাথ প্রেস
১৬৯, ১৬৯।১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট
কলিকাতা-৬

বাঁধাই করেছেন
ভট্টাচার্য বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
১০, কর্ণিস চার্চ লেন
কলিকাতা-৯

প্রকাশক কর্তৃক

॥ উৎসর্গ ॥

'যাঁরা আমার সাঁজ সকালে জ্বালিয়ে দিল আলো'

পরিচয়

কয়েক বৎসর আগে শ্রীমান নচিকেতা ভরদ্বাজ আমার অন্যতম ছাত্র হিসেবে আমার সঙ্গে বৎসরকাল কাটিয়েছিল। তার প্রচ্ছিত অনুরাগ এবং সতেজ প্রতিভায় আমি তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম। শিক্ষক-জীবনে এ ধরণের অভিজ্ঞতা বারবার ঘটে, আশ্চর্য হ'বার কিছু নেই। প্রথম পরিচয়ের কিছুদিন পরই মনে হ'য়েছিল, নচিকেতার ভেতর কোথাও নিজকে ব্যক্ত করবার, মানুষের বৃহত্তর পরিবেশকে স্পর্শ করবার একটা দুরন্ত ক্ষুধা আত্মগোপন করে আছে, এবং তারই তাড়নায় মাঝে মাঝে তার মধ্যে একটা ক্ষুব্ধ চাঞ্চল্য দেখা দেয়। প্রশ্ন করেছিলাম, 'তুমি কি কিছু লেখ?' সলজ্জ হাস্যে উত্তর দিয়েছিল, 'হ্যাঁ, লিখি তো, অনেক লিখেছি, কিন্তু ছাপা বিশেষ কিছু হয়নি', কেউ ছাপতে চায় না।' তখন আমার জানা ছিল না নচিকেতা কবিতা লেখে।

পরীক্ষা পাস করে নচিকেতা দূরে সরে গেল, কিন্তু মাঝে মাঝে দেখা করতে আসতো; বলেছিল, কোথায় কোন্ একটা লাইব্রেরীতে কাজ নিয়েছে, খুব খাটতে হয়। বলেছিলাম, 'জীবন ধারণের জন্ম মানুষকে সংগ্রাম তো করতেই হয়, বিশেষত নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজে। কিন্তু নিজকে প্রকাশ করবার সংগ্রামও তো কিছু কম নয়, সে-সংগ্রাম থেকে দূরে সরে যেও না।' বলেছিল, 'না, তা' আর পারছি কই। তা' ছাড়া, তা করবোই বা কেন? তা'লে বাঁচবো কি নিয়ে!' আশা, বিশ্বাস ও উৎসাহের অভাব তার ভেতর কখনো দেখিনি'।

তারপর, গত দু'তিন বৎসর আমার দেশ বিদেশ ঘুরে ঘুরেই কাটছে, কোথাও স্থিতিলাভ ঘটছে না। নচিকেতার সঙ্গে দেখাশুনোও আর নেই। এরই মধ্যে ক'লকাতায় নচিকেতার একটি চিঠি পেলাম একদিন। জানলাম, দু'বৎসর সে কঠিন ক্ষয়রোগে শয্যাগত, যমের দুয়ার থেকে ফিরে এসে বিছানায় শুয়ে শুয়ে জীবনের স্বপ্ন রচনা করছে! মনটা বড় খারাপ হ'য়ে গেল। এমন প্রসন্ন, দীপ্ত চোখে মুখে, এমন সুদীর্ঘ ঋজু দেহে এ কি দুর্মর কীটের কুটিল আক্রমণ!! চিঠির জবাবে তাকে তার জীবনের আশা বিশ্বাস ও স্বপ্নের কথা স্মরণ করিয়ে দিলাম। ভাবলাম অচিরেই একদিন তাকে দেখতে যাবো।

কিন্তু, দুদিন যেতে না যেতেই আবার আমার দেশের বাইরে ডাক পড়লো। দু'মাস পর রেঙ্গুনে বসে তার এক চিঠি পেলাম, রোগশয্যায় শুয়ে শুয়েই বন্ধুদের প্রীতি ও সৌজন্যের নৌকোয় ভর করে সে তার প্রথম কবিতার বই ছাপবার যোগাড় করছে, আমি সে-বইএর পরিচয়পত্র লিখে দিলে সে খুব খুশী হয়। এ-অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করবো এমন সাধ্য ছিল না আমার। সানন্দে রাজি হলাম, এবং লিখে পাঠালাম, ছাপা শেষ হ'লেই প্রুফ্ ফর্মাগুলো আমায় পাঠিয়ে দিতে।

সেই ফর্মাগুলো আজ মাসাধিক কাল আমার সঙ্গে সঙ্গে; মাঝে মাঝে যখন অবসর পাই খুলে খুলে পড়ি একটি দু'টি কবিতা। এই ভাবেই একাধিক বার পড়া হ'য়ে গেল সবগুলো কবিতা।

দু'চারটি ছাড়া এ-বইএর প্রায় সব কবিতাই নচিকেতার ১৫ থেকে ২৫ বছর বয়সের ভেতর বিভিন্ন সময়ে লেখা। জানিনে কি কারণে, বোধ হয় অসুস্থতার দরুণ, সে তার একান্ত সাম্প্রতিক কবিতাগুলো এ-বইএর অন্তর্ভুক্ত করেনি'; তেমন দু'একটি কবিতা আমি পড়েছিলাম এবং আমার ভালো লেগেছিল। তা' ছাড়া, কবিতাগুলো বোধ হয় কালানুক্রম ধরে সাজানো হয়নি', যে কারণেই হোক। প্রধানত, এই দু'টি কারণে কবির ভাবানুভূতির এবং আঙ্গিকের বিবর্তন অনুসরণ করা একটু কঠিন। তা ছাড়া, এ-ও বোধ হয় যে-কোনো মনোযোগী পাঠকের দৃষ্টি এড়াবে না যে, কবিতাগুলি কোনো পরিণতির দিকে ইঙ্গিত করে না। সঙ্গে সঙ্গেই বোধ হয় বলা উচিত, এ-বয়সের রচনায় সে-ধরণের ইঙ্গিত আশা করাও হয়তো অন্যায়। কিছু কাঁচা হাতের পরিচয়ও কবিতাগুলোতে আছে; আবেগ ও ভাবানুভূতির অতিবিস্তর, বাগবিন্যাসের বাহুল্য এবং আঙ্গিকের প্রতি দৃষ্টিশৈথিল্য কোথাও কোথাও অতিপ্রত্যক্ষ। স্পষ্টতই, কবিতাগুলি আরো মার্জনার অপেক্ষা রাখে, অস্পষ্ট ভাবাবেগ আরও সংযত শাসনের অপেক্ষা রাখে। প্রথম যৌবনবন্যার ঢেউ তটের শাসনকে যেন অমান্য করে চলতে চেয়েছে। এ-ও বোধ হয় খুব স্বাভাবিক। তবু স্বীকার করতেই হয়, বন্ধনকে না মান্‌লে মুক্তি যে দুর্লভ।

এ সত্ত্বেও অকপটে স্বীকার করি, নচিকেতার এই কবিতাগুলো আমার ভালো লেগেছে। পরিণত, পরিমার্জিত কবিমানসের সুস্পষ্ট, মার্জিত প্রকাশের হয়তো অভাব একটু আছে কবিতাগুলোতে, কিন্তু নিঃসংশয়ে স্বীকার করি, নচিকেতার মন কবিমন, তার দৃষ্টি কবির দৃষ্টি, তার চিত্ত সূক্ষ্ম সংবেদনায় সাড়া

দেয়, তার ভাষা ও বাক্‌ভঙ্গিতে কাব্যের সুর-মহিমা আছে। তার আবেগের নিষ্ঠা, বক্তব্যের সারল্য ও সততায়, তার উদ্দীপনার উত্তাপে এবং যৌবনদীপ্তির প্রাচুর্যে আমি প্রীত ও আনন্দিত বোধ করেছি। তার ভাবকল্পনার সুস্থ বলিষ্ঠতা এবং প্রাগ্রসর চিত্তের মানবিক আবেদনও আমার ভাল লেগেছে।

যে ক'টি গুণের কথা বললাম এগুলি বোধ হয় কিছু আকস্মিক নয়। ইহাদের জন্ম, মনে হয়, তরুণ কবির কাব্যভাবনার আদর্শের মধ্যে। সম্প্রতি একটি পত্রে প্রসঙ্গক্রমে সে তার কাব্যাদর্শ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা জানিয়েছে। এ-কথা ক'টির ভেতর বোধ হয়, তার 'ক্রীড্'-এর কিছুটা আভাস পাওয়া যাবে, এবং তার নিষ্ঠা, সারল্য, সততা ও উদ্দীপনার কারণও কিছু পাওয়া যাবে।

> "কোনো শিল্পই মুষ্টিমেয় মানুষের জন্য হ'তে পারে না। আমার মতে, মোটামুটি রসিকজন আমরা সবাই। কলাকৌশলের অন্ধিসন্ধি বিশ্লেষণ, সাহিত্যবিচারের ক্ষমতা হয়তো অনেকেরই নেই, কিন্তু সত্যিকার সার্থক শিল্পায়ন হ'লে একটা সহজ অনুভূতির স্বাভাবিক রসাবেদন থাকবে কম-বেশি সবার কাছেই। কারণ, শ্রেষ্ঠ শিল্প সব সময়ই সার্বভৌম। ...সহজতম আঙ্গিকে বহুজনহৃদয় সংবেদ্য যে ভাবানুভূতি তা-ই আমার কাব্যবস্তু। আধুনিক বাংলা কবিতা লোকে পড়তে চায় না, এর প্রতিবাদ করতেই আমার এ কাব্য সংগ্রহ।"

নচিকেতার এই 'ক্রীড্' যুক্তিগ্রাহ্য কি নয়, এ-প্রশ্ন অবান্তর। কিন্তু, তার এই কবিতাগুলি তার 'ক্রীড,'-এর সমর্থক। এদের জন্মস্থান সহজ অনুভূতির মধ্যে, এদের রসাবেদন প্রত্যক্ষ এদের আঙ্গিক সহজ, এবং এদের ভাবানুভূতি বহুজনহৃদয় সংবেদ্য, একথা বোধ হয় স্বীকার করতেই হয়।

নচিকেতা সম্পূর্ণ সুস্থ হ'য়ে উঠুক, এই প্রার্থনা করি। তার কাব্যপ্রচেষ্টা বিস্তৃততর ও গভীরতর জীবনাভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হোক, এই কামনা করি। তার প্রথম এই প্রয়াস সহৃদয় পাঠক সমাজের অভিনন্দনে ধন্য হোক্।

রেঙ্গুন, ২৫শে বৈশাখ, ১৩৬১ — নীহাররঞ্জন রায়

॥ সূচী ॥

ফরমান

"What though the field be lost ?
All is not lost—th'unconquerable will
...And courage never to submit or yield."

শ্রান্ত কপাল থেকে টস্‌টসে ঘামগুলো মুছে ফেলে
কাঁধে লাঙল আর হাতে নিয়ে কোদাল
শস্য-শ্যামা পৃথিবীর দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করে মানুষ,—
"খুশী হয়েছ তুমি সুন্দর ?"
"না !"—সুস্পষ্ট উত্তর ঘোষণার মত ভেঙে পড়ে।

তপস্বী মানুষ এগিয়ে চলে আবার :
মাটি পুড়িয়ে, পাথর কেটে গড়ল বড় বড় ইমারত
ছুঁয়ে ছেনে ভেঙে গ'ড়ে অস্থির করল পৃথিবীটাকে
অস্থির হল নিজে ;—মনের মত হচ্ছে না !

সাগরকে বাঁধল সেতু-বন্ধনে,—পৃথিবীকে পথে,
মিনারে গম্বুজে উড়িয়ে দিল আপন বিজয়ধ্বজা।
রথচক্রের ঘর্ঘরে মুখর হল দিগন্তর—
মেরুতে আর মরুতে অধিকার হল প্রতিষ্ঠিত
মাটিতে—আকাশে আর জলে।
'সুন্দর তুমি খুশী?'—আবার প্রশ্ন করে মানুষ।
'না"! উত্তর সেই একই।

মনস্বী মানুষের জয়-যাত্রা সুরু হয় আবার:
কলম আর ছেনি নিয়ে বসল স্রষ্টার আসনে—
রঙে-রেখায়-তুলিতে কাগজে আর পাথরে
গহন মনের অরূপ কল্পনাকে দিল আশ্চর্য অভিব্যক্তি।
ছন্দে সুরে রচনা করল তার বন্দনা-গান।
সযত্ন সৃষ্টি-স্বাক্ষরে অপরূপ হয়ে উঠল পৃথিবী।
স্রষ্টার অপূর্ণতা পূর্ণ ক'রে চলল মানুষ:
বল্মীক স্তূপের তলায়, 'ইহাসনে' নিশ্চিহ্ন হল শরীর
ধ্যানস্থ তন্ময়তায় 'রাত কৈল দিবস দিবস কৈল রাতি'।
স্বপ্নিক মানুষের চোখে অঞ্জন পরাল তার প্রেম-নিষ্ঠা—
যমুনার তীরে তীরে তার অভিসারের পদরেখা;
মাথুর থেকে নিয়ে আসতে হবে কৃষ্ণকে—
কোথায় সে কতদূরে?
শিল্প-সমৃদ্ধ পৃথিবীর নতুন রূপে মুগ্ধ হল মানুষ—
প্রশ্ন করে,—"খুশী হলে সুন্দর?"
"না"! কঠিন উত্তরের ব্যতিক্রম হল না তখনো।

অতৃপ্ত মানুষের শেষ নেই তবু পথ পরিক্রমার:
উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতিকে বাঁধল নিয়মের কঠিন সংযমে

জড়ের মধ্যে আনল গতির সংবেগ।
বস্তুর বন্ধন থেকে মুক্তি দিল পদার্থের পরমাণুকে,
যন্ত্রের আবর্তনে ঐশ্বর্যময়ী হল সুজলা সুফলা মাটি।
সাগরে ভাসাল, আকাশে উড়িয়ে দিল নিজেকে,
পেলিওলিথিক্ থেকে লৌহ-তাম্র-পথ অতিক্রম ক'রে
প্রস্তর-গিরি-কান্তার পথে চলে এল হেলিকোপটারে।
অগ্নিহোত্রী সাধনার বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই তবু
জাগর রাত্রির প্রহরে প্রহরে গুঁড়িয়ে দিল আপনাকে নিঃশেষে।
জয় করবে বিশ্ব-স্রষ্টাকে এই তার পণ।...

কিন্তু তা বুঝি আর হল না; তার আগেই
মানুষের মধ্য থেকে বেরিয়ে এল একটা অতিকায় আদিম সরীসৃপ,—
তার বিষাক্ত লেজের হিংস্র ঝাপটে
আঁচড়ে আর কামড়ে অস্থির হয়ে উঠল পৃথিবী।
যে জন্তুটা ভয়ে লুকিয়েছিল এতদিন বেরিয়ে এল সে গহ্বর থেকে;
লোভের উচ্ছৃত লাভায় ব্যতিব্যস্ত, বিধ্বস্ত হল সংসার।
শিল্পীর শুভ্র হাতেও জ্বলে উঠল ধ্বংসের আগুন
বিভ্রান্ত, আত্মবিস্মৃত হয়ে যোগ দিল শিবিরে শিবিরে:
আগুন! আগুন!! সর্বনাশা আগুন!!!
বীভৎস উল্লাসে পুড়িয়ে ফেলল আপনার শিল্প-সাধনা সব,—শব।
ভুলে গেল কী প্রতিজ্ঞা নিয়ে বেরিয়েছিল পথে—
আপনার কাছে কী ছিল তার প্রতিশ্রুতি!—
হারিয়ে ফেলল তার পবিত্র ফরমান—মহান মুক্তি-পাঞ্জা।...

সংবিৎ যখন ফিরে এল, লজ্জায় ক্ষোভে মাথা হল নীচু
নিজের কাণ্ড দেখে ঘৃণা হল নিজের উপর—কী করেছে!
মুখ তুলে তাকাতে পারে না সুন্দরের দিকে।

বিধ্বস্ত পৃথিবীতে তবু নতুন শপথ নেয় মানুষ
তীর্থপথ আবার মুখর হয়ে ওঠে তীর্থঙ্করের পদচিহ্নে—
খুঁজে আনতে হবে হারিয়ে-যাওয়া ফরমান।
এবার নতুন পথে :
ধ্যানস্থ আসনে তন্ময় শিল্পীর ভূমিকা আর নয়
সচেতন হতে হবে সৃষ্টির উত্তরাধিকার নিয়ে,—
একটি ফসলও যেতে দেব না স্বার্থপরের শিবিরে
সহযোগী হব না আর কারো হিংস্র শিকারের
শিখণ্ডীর মূক অভিনয়ে সর্বনাশ করব না পৃথিবীর,—আমার।
আমার শিল্প-ফসলে অধিকার থাকবে সবার,
বর্বর পশুটাকে আর থাবা মেলতে দেব না কিছুতেই
খুশী করব স্রষ্টাকে—শান্তির কপোত উড়বে,...উড়বে...উড়বে...
নরম পাখায় আবার ঝক্‌মক্ করবে হীরক দিনের শুভ্রতা।

শাশ্বত

সময়ের শালবনে তবু বার বার
উদাসী বাতাস কাঁদে সমুদ্রের লোনা জলে ভিজে।
লেলিহ দাবাগ্নি আসে পুড়ে যায় সব
গাছপালা, পাখী-নীড়, জীব-জন্তু, সবুজ ঘাসেরা ···
বিধ্বস্ত শকুন তবু বাসা বাঁধে অস্থির বিস্ময়ে।
সস্নেহ জ্যোৎস্নার হাতে, নীল মেঘে বর্ষার প্রলেপে
নতুন সুখের ধারে সব ক্ষত ধুয়ে যায়,—অতীত আঘাত।
বাসা বাঁধে, পোড়া দেহে পালক গজায়।
চৈত্রের শিবির থেকে অফুরান প্রাণের বারুদে
সাদা ছাই, নীল জলে অঙ্কুরিত মৃত্যুঞ্জয়ী ঘাসের মিছিল,
আবার নিঃশ্বাস ফেলে অগ্নিদগ্ধ শাখা।
দক্ষিণ সমুদ্র থেকে হাওয়া আসে অনুরাগ নিয়ে—
আবার মুখর হয় দিগন্ত-মেখলা।
কম্পিত ডানার নীচে প্রেমভীরু শকুনীও কাঁপে
সৃষ্টির সমুদ্র নামে চঞ্চু-লুব্ধ দেহের বলয়ে—,
ধারালো কুৎসিত ঠোঁট পালকের ফুলশয্যা খোঁজে—
নরম রোদের মত শক্ত ঠোঁট গ'লে গ'লে পড়ে,
—ঝরণার উৎসার যেন উত্তাপে নিবিড়—
চোখ-বোজা শকুনীর ঘাড়ে পিঠে উদগত পালকে।

আকাশে আসন্ন ঝড়—সমুদ্র চঞ্চল :
পায়ে পায়ে দুঃখ-বাধা, অভাব ও অপ্রাপ্তির আঁধি—
তবু সত্য এই নীড় বাঁধা,—ধ্রুব সত্য মৃত্যু-ম্লান ঝড়ো পৃথিবীতে
সৃষ্টির সোনালী স্বপ্নে উম্ দেয়া অনাগত ভ্রূণে।
বিধ্বস্ত পৃথিবী কাঁদে পদতলে কাঁদুক কাঁদুক

তবু সখী এস নীড় বাঁধি,
নরম স্বপ্নের মোমে ঘর বাঁধি উঁচু ডালে প্রত্যন্ত কুলায়।
বিচূর্ণ বিক্ষিপ্ত শব, শিবিরের ছিন্ন অংশ, রক্ত আর বারুদের দাগ
পরিত্যক্ত সংগ্রামের মৃত পাণ্ডুলিপি ;—
এ শ্মশানে তবু সত্য তুমি আমি শাশ্বত কালের।
অর্থহীন ইতিহাস চেয়ে থাক অবাক বিস্ময়ে।
যুক্ত হাতে দীপ জ্বালি দীপান্বিতা প্রাণের প্রাসাদে।
তুমি আমি : তা না হলে আর কিছু অর্থ এর আছে ?
নামহীন গোত্রহীন যুগে যুগে অজস্র জনতা।

তুমি আমি রাম-সীতা অযোধ্যার অতীত প্রাসাদে,
তুমি আমি ব্যাবলিন, মস্কৌ, মিশরে।
তুমি আমি ইন্দ্রপ্রস্থ কোশল মগধে, মিথিলা ও সিন্ধু থেকে প্রান্ত কামরূপে।
দিল্লীর স্ফুলিঙ্গ-মুখে তুমি আমি পক্ক-গৌড়ে পথে ও প্রান্তরে—
তুমি আমি বোগদাদে, পম্পেইর উৎক্ষিপ্ত লাভায়
তুমি আমি ইতিহাসে পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়।
তুমি আমি পাল, সান, শিলাদিত্য, স্পার্টার শাসনে,
সিন্ধু-নীল-ইয়াংসির ওপারের অন্ধকার নির্জন ছায়ায়।
তুমি আমি এমনি ছিলাম, এমনি একান্ত কাছে হাতে হাত রেখে।
শিপ্রার অপর পারে মালঞ্চ-বিতানে-ঘেরা কোন গুপ্ত বাতায়ন তলে
হয়ত বাসবদত্তা তুমি ছিলে চিত্রা, মালবিকা,
উগ্রসেন, দেবদত্ত আমি
মণি-দীপ-দীপ্ত কক্ষে স্পন্দিত বাসরে।
অথবা উপান্ত বনে আফ্রিকার নীরব নিশীথে
উন্মত্ত কাঁপিয়ে পড়ি উচ্ছৃঙ্খল, তরঙ্গিত দেহ-উপকূলে
বর্বর-কুমারী তুমি, সুরাসিক্ত আমি এক বর্বর-কুমার কামনা-কম্পিত,—
উপরে আকাশ, নীচে পর্ণ-শয্যা শুধু ;

স্থবিরে পাহাড় ভাঙি মুক্ত স্বচ্ছ হাসির ঝরণা।
তোমার রক্তাভ ঠোঁটে সে হাসিরই আশ্চর্য ঝঙ্কার
কিছু সুর কিছু রেশ কম্পমান মিড় :
অজন্তা-হরপ্পা-রোম লাল ঠোঁটে গ'লে গ'লে পড়ে।
কপোলে চিবুকে বুঝি বাসা বাঁধে ইস্তাম্বুল, অবন্তী, ইরান।

উতলা ফাল্গুনে কিম্বা অস্পষ্ট জ্যোৎস্না রাতে, রিমিঝিমি শ্রাবণ তিমিরে
বক্ষলগ্ন বাহুবদ্ধ ছিলাম দু'জনে, তুমি আমি দুইজন শুধু।
ভূমিকম্প-ঝড়বৃষ্টি-অগ্ন্যুৎপাতে অসংখ্য প্লাবনে,
সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপে, মহামারী-মন্বন্তরে কণ্ঠলগ্ন আমরা দু'জন।
চিতার বিধূম্র বহ্নি রাঙায়েছে নীবী ও নিচোল
প্রেম আরও হয়েছে নিবিড়।
শালবন পুড়ে গেছে বার বার দাবাগ্নির প্রচণ্ড শিখায়
আবার বেঁধেছি বাসা নতুন আগ্রহে,
সৃষ্টির স্বাগত স্বপ্নে শ্মশানের সাদা ধূলে প্রাণপণ বেঁধেছি বাসর।
বলিষ্ঠ দু'পাখা মেলি সময়ের নীল শূন্যে সাঁতার কেটেছি,
এসেছি প্রান্তর-পথে তুমি আমি পার হয়ে শত শত সমুদ্র-পর্বত।

তোমার চোখের নীলে তাই বুঝি ছায়া ফেলে বৃন্দাবন-বিদেহ-দ্বারকা
দিগন্ত-ভুরুর নীচে গ্রীস, রোম, খোরাসান, আলেকজান্দ্রিয়া।
তোমার সুমেরু বক্ষে উন্মত্ত কামনা
বাসনা-বিক্ষুব্ধ রাতে কোনো গুহা-মানবীর,—ব্যাঘ্র-ছাল-মুক্ত বিবসনা।
কালো চুলে বাসা বাঁধে ফেলে-আসা অজস্র রাত্রিরা :
সেই রাত্রি এথেন্সের, উজ্জয়িনী কিম্বা বিদিশার,
প্রাসাদের প্রান্তকক্ষে, উপবনে অশোক-আসনে,
মাতাল মহুয়া বনে সেই রাত্রি শৈলতটে প্রসুপ্ত কুটিরে।
তোমার পায়ের ছন্দে বাজে তাই কথাকলি বেদুইন-তাতারী-চণ্ডালী

নৃত্যক্লান্ত কালো দেহ জ্যোৎস্না রাতে মদিরা-বিবশা।
তোমার ধমনী রক্তে কথা কয় চুপি চুপি কালাতীত অজস্র নারীরা :
নিগ্রো থেকে নিগ্রোবটু, সাঁওতালি, অনার্য-তনয়া—
পুত্র-কামা সীমন্তিনী, অতীতহ্ন রাজকন্যা কুণ্ঠাহীন, যৌবোদ্ধত মুক্ত যাযাবরী,
তাদের আরতি হোমে ধৌত-মুগ্ধ সূর্য-শিখা তনু।
আমারো পেশীতে রক্তে দীপ জ্বালে যুগান্তের সহস্র পুরুষ
পুরুষের সর্বত্যাগী উন্মাদ কামনা।

আমরা আদম-ইভ সনাতন স্বর্গচ্যুত মানব-মানবী—
আমার বাসরে তাই বিধাতার অভিশাপ নিত্য সমুদ্যত ;
বার বার পুড়েছে বাসর।
তবু, তবু মর্ত্যে স্বর্গের সাধনা, তুমি আমি প্রত্যহের পথে
কালের সমুদ্র বেয়ে পাশাপাশি সোনার তরীতে।
অনাদি অতীত সেই মৃত্যুহীন তুমি আর আমি
আজ মোরা বর্তমানবাসী।
প্রাণের নিভৃত যোমে এস তাই নীড় বাঁধি আবার এখানে
শত্রু হাতে বিধ্বস্ত এ ঝড়ো পৃথিবীতে ;
আবার সোনালী রোদে মুক্ত পাখা আকাশে উড়ুক।
শ্মশানের তালবৃক্ষে তুমি আমি, শকুন শকুনী।

মোহর

খেটে খেটে ক্ষয়ে যাওয়া

ডাকখানার ক্লান্ত, ক্লেদাক্ত মোহর আমরা .'

চার দেয়ালের বন্ধন থেকে মুক্তি নেই আমাদের এক মুহূর্ত—

স্যাঁতসেঁতে অন্ধকারে চাপা প'ড়ে আছি চিরকাল।

বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই আমাদের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের :

দিনে রাতে—সকাল থেকে সন্ধ্যা

নিরলস নিষ্ঠায় এগিয়ে চলেছি ঝপ্, ঝট্ ঝটাং—

মাথা নীচু করে দীক্ষা দিচ্ছি তোমাদের চিঠিগুলোকে।

ভোরের নরম রোদে উজ্জ্বল হয়ে না উঠতেই

দগ্ধ দুপুরের তৃষ্ণার্ত ঘামে ভিজে উঠি আমরা রোজ।

নিশীথ রাত্রির নৈঃশব্দ্য ভেঙ্গে শব্দ হচ্ছে ঝপ্, ঝট্ ঝটাং—

তোমার প্রত্যেক চিঠির কপালে পরিয়ে দিচ্ছি প্রাণের তিলক।

সুখ দুঃখ হাসি কান্নার অজস্র সংবাদে-ভরা ছোট বড় চিঠিগুলি :

পিকিং থেকে পোর্ট আর্থার, অ্যালাস্কা থেকে অষ্ট্রেলিয়া—

বম্বে-দিল্লী, লণ্ডন-করাচী, সব জায়গায়—সর্বত্র,—

মৌন মোহরের কালো স্বাক্ষরেই গতি তাদের নিরঙ্কুশ।

তোমাদের মরা চিঠিগুলি গতিময় প্রাণ-পত্র হয়ে ওঠে আমাদের স্পর্শে।

তোমরা তো ডাকবাক্সে চিঠি ফেলেই খালাস

জানোনা মূক চিঠিগুলোকে গতির ছাড়পত্র দেয় কারা ?

কাদের প্রাণমন্ত্রে পাখা পেল তোমাদের সংবাদ—

দুর্বার গতিতে উড়ে এল তোমার দুয়ারে

পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে ?

খুশীমত তোমরা চিঠি লেখ আর পড়,

চিঠিটা হাতে পেয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠ সংবাদে
(ওপারের কম্পিত সুর মূর্ত হয়ে উঠেছে রেখার রামধনুতে)।
ফিরে তাকাও না একবার সেই কালো মোহরগুলোর দিকে
আকাঙ্ক্ষিত চিঠিখানা যারা পৌঁছে দিল তোমার হাতে ;—
প্রয়োজনের মাপকাঠিতে ওগুলো তখন মূল্যহীন।—
পড় না তোমরা তাদের দুঃখ-ভরা ইতিহাসের একটি পৃষ্ঠাও
নামগোত্রহীন সেই রাত-জাগা অক্লান্ত কর্মীর দল।
কালো মোহরের ক্ষুব্ধ বুকে জমে আছে কত চোখের জল
কোনো হিসাবই রাখ না তোমরা তার—
এমনি অকৃতজ্ঞ, নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন তোমরা !!

কালের ডাকঘরেও এমনি বসে আছি আমরা মাথা নীচু করে,
ক্ষয়ে গিয়ে, নিঃশেষ ক'রে আপনাকে
যুগে যুগে পারাপার করছি তোমাদের সভ্যতার চিঠি :
অন্ধকার গুহা থেকে শতাব্দীর দীপ্তালোকে—
প্যালিওলিথিক্ থেকে অ্যাটম-যুগে,
এসেছে গরুর গাড়ীর পথ ধরে দুরন্ত হেলিকোপটারে।
ঐশ্বর্যের আনন্দে, প্রাচুর্যের পূর্ণতায় ঝকমক্ করছে তার প্রত্যেক অক্ষর,
সে রক্তিম চিঠি পড়ছ তোমরা সবাই।
অথচ, যাদের লাল রক্তের কালো মোহরে,
দূর দুস্তর পথ বেয়ে চলে এল সে সোনার চিঠি তোমাদের হাতে
তোমাদের অধিকারের আঙিনায়—
অবজ্ঞাত রইল আজো, মনে রাখনি তোমরা তাদের।
পৌঁছে দিলাম আমরা, অথচ অধিকার পেলাম না কোনদিন
সভ্যতার সে সোনার চিঠি পড়ার—সেই মহান পরোয়ানা।
সভ্যতার ঐ স্বর্ণমণ্ডিত ইমারতের দিকে চেয়ে দেখ
চেয়ে দেখ ঐ সু-উচ্চ মিনারের দিকে :

ওর প্রত্যেক ইটে-প্রস্তরে অঙ্কিত রয়েছে আমাদের সুস্পষ্ট মোহর—
বুভুক্ষু-ব্যথিত জীবনের বুকের রক্তে জ্বলছে।
আমাদেরই শ্রম স্বাক্ষরে দীপ্যমান।
তবু তোমরা বল এ সভ্যতা না কি তোমাদের, আশ্চর্য!

প্রিয়া

ঐশ্বর্য অলকাপুরী দূর-দীপা স্বপ্নান্তিক পথে
নামিয়া আসিবে মোর প্রিয়া
হাতে স্বর্ণ-দীপ শিখা নিয়া,
কোনো সুর-স্বর্গ থেকে ভাবি নাই করিনি কল্পনা— ।
সমুদ্র সম্ভবা কোনো উর্বশীর তন্বী-তনু করিনি কামনা,
পৌর প্রেমে তৃপ্ত হয়ে রাজকন্যা কণ্ঠে মোর পরাইবে মালা
নামিয়া আসিবে মধুমালা—
এ আশা করিনি কভু আমি ।
কোনো এক শুভক্ষণে সম্পদের সৌন্দর্যের হব আমি স্বয়ম্বরা স্বামী,
এ আশা করিনি আমি চতুরিকা মালবিকা কোনো
আমারে মাগিয়া লবে বর,
আমার মোহন রূপে বক্ষে কারও বাজে পঞ্চশর ।
গজমোতি মিনারের স্বপ্ন সৌধে চাহিনি বাসর
আমারে করেনি মুগ্ধ কুবের-দুলালী কোনো সুরভিত চিকুর চাঁচর ।
প্রোটিন স্পর্ধিত কোনো লাস্যময়ী মখমল-দেহীরে
প্রার্থনা করিনি আমি আমার যৌবন তীর্থ-তীরে ।
তেপান্তর-পর-প্রান্তে গ্রামান্তের স্তব্ধ নদীতীরে
অশ্বত্থ বকুল ছায়ে প্রশান্ত কুটিরে,
ললিত লবঙ্গলতা সানুপুরা শান্ত নম্র অসূর্যম্পশ্যারে —
আমার যৌবনস্বর্গে ডাকি নাই গৃহ রচিবারে ।
নিভৃতচারিণী বালা আশৈশব গ্রাম্য তার সংস্কার নিয়া
আমারে পূজিবে নিত্য দুরু দুরু চলচল পুষ্প অর্ঘ্য দিয়া :
লজ্জাকর এ সুখ-কল্পনা
আমার মানস-পটে মনুষ্যত্বহীনতার
আঁকে নাই এত বড় কদর্য আল্পনা ।

রবীন্দ্রনাথের মত প্রিয়ারে আমার

খুঁজিতে যাইনি কভু শিপ্রাতট 'পরে

মধুমালতীর বনে, রেবাতীরে, পম্পা সরোবরে।

খুঁজিতে যাইনি তারে অতীতের রোমাঞ্চিত উজ্জয়িনী-কোশল-মগধে

কল্পনায় রথে।

নরম ননীর মত মুখে তার নাই লোধ্ররেণু,—কুরুবক মাথে,

কর্ণে কুন্দকলি নাই ; লীলাপদ্ম নাই তার হাতে।

ঐশ্বর্যের স্নিগ্ধ কান্তি আবরণ অলঙ্কার অঙ্গে নাই তার

কণ্ঠে নাই মুক্তামালা কিম্বা রত্নহার।

মোর প্রিয়া অতি সাধারণ

হীনবিত্ত ঘরে এক অবজ্ঞাত পিতৃত্বের নিয়েছে শরণ।

দিবস রজনী বাঁধা কর্মছন্দে দোসর আমারই

বিরুদ্ধ স্রোতের সাথে ঝঞ্ঝারাতে শিলাবৃষ্টি ঝড়ে যুদ্ধ করি

দুর্যোগ-প্লাবন-পঙ্কে জীবন-নদীতে দেয় একা একা পাড়ি।

আমারই মতন সেও কাজ করে—

কাজ করে দিনমান প্রাসাদের দীপ-কক্ষে ডালহৌসী চত্বরে।

আমারই মতন তার নিরানন্দ কর্মভারে দিনের প্রহরগুলি বাঁধা

নহে কাব্য পাঠে কাটে, প্রেমের গুঞ্জনে, আধুনিক কোনো গান সাধা।

কালির আঁচড় টানি সারাদিন শ্বেতপত্র করি মসীময়

বৈশ্যের দরবার হতে নিয়ে আসে মাসের সঞ্চয়।

আমারই মতন সেও পথচারী ক্লান্ত পদাতিক

এ মাটির ম্লান শিশু কঠিন ভূমিতে ; নীল স্বপ্নে রচে না লিরিক।

প্রত্যহ জীবন তার স্বেদসিক্ত মোরই সাথে চলে এক তালে

আমার তুষার-তীর্থে অরোরার মুক্তি-দীপ জ্বালে।

স্বর্ণযান সভ্যতার শূদ্রগর্ভে সব চেয়ে নীচের তলায়

আমরা অস্পৃশ্য ডোম সমগোত্র দুইজন নগরের উপান্ত ছায়ায়।

আমারই মতন সেও আশৈশব রুদ্ধ পরিবেশে
রিক্ততা দৈন্যের মাঝে হয়েছে মানুষ ; তবু হেসে হেসে
কঙ্করে, কর্দম পঙ্কে নিষ্ঠুর দারিদ্র্য সাথে দিয়েছে সংগ্রাম,
জীবনে পেয়েছে যাহা তার চেয়ে দিল বেশী দাম
মোরই মত পায় নাই নাম
তাই তারে ভালবাসিলাম।

শিক্ষার গৌরব আছে মোরই মত না আছে সম্মান
আছে তার প্রাণ।
আমারই মতন সেও বিত্তহীন চিত্তহীন নয়
সহস্র দুঃখের মাঝে তবু বেঁচে রয়।
কঠিন বাস্তবপথে খর রৌদ্রে, অন্ধকারে সে মোর বান্ধবী
আমার উদয়-পথে সে চারণ কবি,
শয্যার সঙ্গিনী শুধু নয়।
প্রিয়া-চিত্তে গাহি জয় এ মৌক্তিক জীবনের সূর্যমুখী প্রাণের সঞ্চয়।
তাই বলে মহাশ্বেতা, চিত্রাঙ্গদা নয়,
সীতা বা সাবিত্রী নহে দময়ন্তী নহে সাগরিকা
মীরা বা বাসক-সজ্জা নহে সে তো কৃষ্ণপ্রাণ কৃষ্ণাভিসারিকা।

কাঞ্চন-কৌলিন্য কিম্বা অর্থ, মান কিছু নাই তার,
—সৌন্দর্যও যাহা আছে নহে বলিবার
অতি সাধারণ ;—বাঙ্গালী মেয়ের একজন।
আমার প্রস্ফুট চোখে যদিও সে সুদূরের স্বপ্নলেখাঞ্জন।
অঙ্গে অঙ্গে নাই তার লাবণ্যের মায়ামন্ত্র সৌন্দর্যের দান
চকিত হরিণীসম উজ্জ্বল-প্রতিভ নয় ;
প্রতীক্ষাজাগর চোখ অবসাদে ম্লান।

কাঁজাল প্রদীপ্তি নাই চোখে মুখে গালে,

শিরীষ কুসুম সম দেহে তার নাই পেলবতা

জানিও না ছিল কোনো কালে।

কাঁচলি-পিনদ্ধ বক্ষে যৌবনের জয়গানে জাগে নাই উদ্ধত বিদ্রোহ

পরভোজী জীবনের উচ্ছলতা নাই দেহে—মাংসাস্তিক মোহ।

আলোক-শিশির-শূন্য অরণ্যের ছায়া-ঢাকা লতা

আশৈশব অপ্রচুর খাদ্য পেয়ে পেয়ে

দুর্বার তারুণ্য-ধারা নামে নাই তনুস্বপ্ন ছেয়ে।

যাও এসেছিল ধীরে পরীক্ষার ধাপে ধাপে জ্ঞানপথ শেষে

উবে গেছে বুঝি বা নিঃশেষে।

কাব্যের নায়িকা সম বহ্নিরূপা সৌন্দর্যের মধুমায়া নাই

অঙ্গের সুবাসে তার রুনুঝুনু বাজে না তো সুরেলা সানাই।

উন্মুক্ত অলকগুচ্ছ তিমির-নির্ঝর সম তরঙ্গকুটিল তার নহে

অযত্নবর্ধিত কেশ রুখুসুকু পৃষ্ঠদেশে আপনারে একপাশে বহে।

রূপে-মানে-সৌন্দর্যে-সম্পদে,—এই মোর প্রিয়া

তবু তার মাঝে আমি কী যেন সে পেয়েছি খুঁজিয়া,

তবু মোর ভাল লাগে তারে—

নিষ্প্রভ চোখের দীপ্তি নিয়ে যায় মোরে কোন স্বপ্ন-পারাবারে।

দিনের কর্মের শেষে রাত্রির আঁধারে,—

নিশান্তের কোনো শুভক্ষণে

হয় মোর মনে

প্রিয়া যেন অনিন্দিতা পূর্ণ প্রস্ফুটিতা

'উষার উদয় সম অনবগুণ্ঠিতা' :

সৌন্দর্যের আনন্দের সম্পূর্ণ প্রকাশ
শ্রাবণের ভরা মেঘ অথবা এ শরতের সায়াহ্ন আকাশ।
স্পর্শে তার সান্নিধ্যে তাহার, অন্তরাত্মা জাগে।
ভালোবাসি, তারে ভালো লাগে।

প্রেম

আমার যৌবনতীর্থে প্রিয়া মোর এসেছিল নামি,
ভালোবাসিলাম তারে আমি—
সেও কিছু নহে রোমান্টিক
কিম্বা আকস্মিক।
শৈবাল শাদ্বল-ঘেরা কোনো পদ্ম-সরোবর তীরে
বরমাল্য দেয় নাই প্রিয়া মোর শিরে।
কাব্যের নায়ক সম ভালোবাসি নাই তারে প্রথম দর্শনে
বসন্তের প্রাণস্পর্শে লীলায়িত কোনো উপবনে।
আলস্যের অবসরে এ প্রেম বিলাস নহে দেহ বা মনের,
বাসর-শয্যার ভীরু প্রেম—এ তো নহে ষোড়শী কনের।
শিলং পাহাড়ে নয় পূর্বরাগ নব পরিচয়
হাল্কা হাসির ছন্দে রোমান্টিক প্রেম এ তো নয়।
মৃদু নীলালোকদীপ্ত প্রাসাদের গুপ্ত কক্ষে বসি
মৃদু হাসি হাসি
কণ্ঠপ্রবক্ষে-গদগদ এ তো নহে কর্ণমূলে প্রেম সম্ভাষণ।
ইডেন উদ্যানে নয়, লেকপ্রান্তে নত আলাপন,
এ প্রেম নিয়েছে জন্ম কর্মছন্দে প্রত্যহের জীবনের পথে।
'চন্দনচর্চিত ভালে' প্রিয়া মোর নামিয়া আসেনি কোনো রথে
'উৎসবের বাঁশরী সঙ্গীতে—রক্ত পট্টাম্বরে।'

জীবনের প্রতি ছন্দে প্রতি কর্মে সে চিনেছে মোরে,
তারে চিনিয়াছি আমি মিলিয়াছে পূর্ণ পরিচয়
রাজপুত্র নই আমি, সেও জানে যেমন সে রাজপুত্রী নয়।
চিনে ভালোবেসেছিনু, দেখে তারে ভালোবাসি নাই—
সে নারীর অন্তরে আমি নিজেরে খুঁজিয়া যেন পাই ;

নিজের চিন্তার অংশ দিতে পারি—সে আমার একান্ত আপন।
তাই তারে একদিন বলেছিনু অন্তরের ইচ্ছাটি গোপন
আমার যৌবন-স্বপ্নে ডেকেছিনু তারে।
সেও মোরে দিয়েছে স্বীকৃতি একদিন কর্ম অবসরে—
পেয়েছি তাহার হাতখানি,
চোখে তার শুনিলাম মোর যত অকথিত মুগ্ধ মনবাণী ;
আপন বক্ষের মাঝে নিয়েছিনু টানি
যৌবনের সত্য স্বপ্নখানি।
আমি তার চিরন্তন মধ্যবিত্ত বঙ্গ স্বামী নয়,
সংসারের শত কর্ম দিনে, নিস্তব্ধ রাত্রিতে দেবে দেহ
—এই তার নহে পরিচয়।
আরো এক পরিচয় আরো এক ইতিহাস আছে
রাত্রির সুপ্তিতে নয়, মোহমুক্ত দিবসের পৃথিবীর দেবোত্তর কাজে।
আর কেউ জানে নাকো, শুধু আমি, আমি মাত্র জানি
আপনারে ধন্য বলে মানি।
আমার বলিষ্ঠ প্রেম শুধু মাত্র নয় তার তনুছন্দ ঘিরে
আমার শাশ্বত ইচ্ছা মুক্তি পেল প্রিয়ার অন্তরে।
আমার জীবনপথে আমারই সতীর্থ বন্ধু এসেছে নামিয়া
ধন্য তার প্রেমে আমি, সে আমার প্রিয়া॥

হাসি

মানুষের হাসি যে এত বীভৎস হতে পারে—এমন কুৎসিত,
জানতাম না দেখিনি কোনদিন ।
ঝাঁঝাঁ দুপুরের পটভূমিতে এক ঝলক বিষাক্ত নিষ্ঠুরতা
বাঁকা ঠোঁটের ভাঙা পেয়ালা থেকে পিছলে পড়ছে
পচা মদের বিষ-ফেনার মত ক্লেদাক্ত দুর্গন্ধ ।
নরক থেকে উঠে-আসা একটা ভয়াল কৌৎসিত্য—
একটা ভ্যাপসা গন্ধে নিঃশাস বন্ধ হয়ে আসে !
সেদিন এই নগরীর পথেই দেখলাম সে হাসি ঃ
গর্জনক্ষুব্ধ ছত্রভঙ্গ একটা উদ্ধত মিছিলের আগে
রিভলবার-আঁটা ভারী বুট পরা এক নগর-কোতোয়ালের মুখে ।
বোধ হয় কোনো আঞ্চলিক অধিকর্তা হবে !
সশস্ত্র কোটালেরা সঙিন উঁচিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে আছে
বন্দুকের চোঙগুলো থেকে ধোঁয়া উড়ছে তখনো ।
রক্তাক্ত, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কতকগুলো মানুষ ছটফট করছে যন্ত্রণায়
ধুলো-রক্তে বিপর্যস্ত, কেউ বা নিস্পন্দ স্থির হয়ে পড়ে আছে ।
কালো পিচের রাস্তার উপর তাজা রক্তগুলো ঝক্‌ঝক্‌ করে ।
শিকার-সামনে বাঘের হিংস্র লোলুপ হাসি—
পাশবিক চিৎকারগুলো ঝল্‌সে উঠছে মুখের কুঞ্চনে ।
একটা পৈশাচিক উল্লাস থম্‌কে আছে
একটা লোভার্ত অশুচি পিচ্ছিলতা,
অশ্রুত একটা বিকট তরঙ্গায়িত গর্জন ।

তবু হাসির মধ্যে কোথায় যেন একটা আর্তনাদ লুকিয়ে আছে
একটা ভয় ; কান পাতলে শোনা যায় !
ঠিক হাসি বলে চিনতে যেন ভুল হয় !!

আদি-মানবীকে লুব্ধ করেছিল যে পিচ্ছিল সাপটা
তার মুখেও বুঝি সেদিন এমনি হাসি ছিল—
এমনি ক্রুর, ভীত, প্রাণপণ-সন্ত্রস্ত হিংসুক হাসি।
শিকারের কাঁটাবিদ্ধ তিমির ভয়াল মুখ-বিকৃতির সঙ্গে
কোথায় যেন যোগ আছে এর।
ফাঁদে-পড়া মৃত্যুভীত বাঘের উন্মত্ত ঝাঁপিয়ে পড়ার পিছনে
যেমন থাকে একটা করুণ সুর,
এই উৎকট ভিপো-হাসির মধ্যেও কোথায় যেন
নিশ্চিত আভাস আছে তার।
কে জানে! বীণা বাদনের অবকাশে নীরোর মুখেও সেদিন
এমনি অদ্ভুত সর্বনাশা হাসি জ্বলেছিল কি না!—
বহ্নি-বিক্ষুব্ধ আসন্ন-পতন রোম সাম্রাজ্যের উঁচু মিনারে বসে।
সুন্দর মানুষের নিষ্পাপ, ফুলের মত হাসিকে
এমন কলুষ-কুৎসিত বর্বর বীভৎস করল কারা?—
সে পরিবেশ থেকে কি মুক্তি নেই মানুষের কিছুতেই—
যখন মানুষের মুখে সহজ স্বাভাবিক হাসি ফুটে উঠবে আবার
মানুষের হাসি পবিত্র হয়ে উঠবে ফুলের মতই!

ক্রোধ

এগিয়ে গেলাম সে মিছিলের পেছনে:
ক্রোধ যে এমন সুন্দর হয়ে উঠতে পারে মানুষের মুখে,—
মানুষ যাকে চায় না—সেই অমানবিক ঘৃণ্য রিপু ক্রোধ,—
—তাও দেখলাম সেই প্রথম।
অন্ধকারের বিরুদ্ধে সূর্যের রক্তিম অভিযানের মত মহিমময়,
আসন্নবর্ষণ মেঘের বুকে বিদ্যুতের মত জ্যোতির্ময়
অমনি সম্ভাবনা-মুখর—প্রাণচেতনায় পবিত্র।

বিধ্বস্ত মিছিল ভেঙে পড়েছে চারদিকে টুকরো টুকরো হয়ে
আর সশস্ত্র ওরা সঙিন উঁচিয়ে তখনো সারিবদ্ধ
অত্যাচারের দুর্গদ্বারে সদম্ভ পাহারা।
নতুনকে কিছুতেই আসতে দেবে না ওদের অচলায়তনে।
উত্তাল ঝড়ো সমুদ্র তাই ফেটে পড়ছে গর্জনে
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ জনতার সীমাহীন বিক্ষুব্ধ সমুদ্র।

রাস্তার মোড়ে একটা দল আবার এগিয়ে যাবার সংকল্প নিয়েছে—
তাদের দলপতি এক তরুণ সেনাপতি – নিরস্ত্র
প্রাণের পাশুপতে সমৃদ্ধ, উদ্দাম।
ক্রোধের রক্তাক্ত সূর্যে লাল হয়ে উঠেছে তার মুখচ্ছবি
তরুণ সূর্যের মত থরথর করে কাঁপছে ধক্‌ধক করে জ্বলছে।
এলোমেলো চুলগুলি উদ্ধত,-জটার মত ফুলে উঠেছে,
ঘামের সাদা সাদা মুক্তোর টুকরোগুলি
ঝক্‌ঝক করে উঠছে ওর রক্তিম মুখের স্বর্ণপাত্রে।

উদার বিস্তৃত কপাল কুঞ্চিত হয়ে উঠছে বিদ্বেষে আর ঘৃণায়—
নরম ভিজে গালের উপর অবিন্যস্ত কয়েকটি অলকচূর্ণ,
দীর্ঘায়ত চোখ দুটিতে ক্রোধের বহ্নিস্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত
কালো বঙ্কিম ভুরুতে সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয়।
সেই উদ্দাম জনতার সম্মিলিত জয়ধ্বনির সঙ্গে
ওর হাতখানা তালে তালে উঠছে, নামছে:
রক্তাক্ত পতাকাখানা যেন অগ্নিহোত্রী প্রাণের প্রজ্জ্বলন্ত মশাল
সূর্যাক্ত আকাশে দাউ দাউ করে জ্বলছে।
দুরন্ত বহ্নি-মিছিলের আগে যেন পবিত্র ধূপাধার
কালো চুলে তার রোষের ধূমোদ্গার।

বিন্ধ্যের স্পর্ধিত বন্ধনের সামনে ঋষি-পিতৃ অগস্ত্যের মুখচ্ছবিও
বুঝি এমনি রোষ-দীপ্ত হয়েছিল—
ক্রোধের সশ্রদ্ধ বহ্নিতে এমনি প্রজ্জলন্ত, দুর্বার।
ক্রোধ-সমুদ্ধত গ্রীক্-দেবতা অ্যাপোলো যেদিন
নেমে এসেছিলেন মর্ত্যাভিযানের পথে—
তাকেও বুঝি এমনি সুন্দর দেখিয়েছিল!
ট্রোজান্ যুদ্ধে অগ্রগামী প্রতিবাদী দেবতার চেয়েও জ্বলন্ত!!
জানি না, মহিষাসুর-বিধ্বংসী রণচণ্ডীর সুন্দর মুখও
সেদিন এমনি তীব্র তীক্ষ্ণ ছিল কি না!
এ ক্রোধ তার চেয়েও দেবোত্তর—মহান!!
অথবা, একি বন্ধনক্ষুব্ধ স্বষ্টির দেবতা প্রমিথিউস
নতুন স্বষ্টির স্বপ্ন বুকে নিয়ে এগিয়ে চলেছে দৃঢ় পদক্ষেপে,
চোখে তার অনাগত উজ্জ্বল ভবিষ্যত।
ক্রুদ্ধ নটরাজ যেদিন নিষ্ঠুর প্রলয়নৃত্যে মেতে উঠেছিলেন
পুরাতন জীর্ণ পৃথিবীটা ভেঙে ফেলতে
তাঁর চোখেও বুঝি এমনি বহ্নি-বিদ্যুৎ ছিল
তার জ্যোতির দেহও বুঝি জ্বলে জ্বলে উঠেছিল এমনি।
এমনি ভয়ানক সুন্দর,—ভীষণ অপরূপ।

যে আশ্চর্য যাদুমন্ত্রে ক্রোধও এমন সশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে—
সেই সর্বকল্যাণময় মহান স্বষ্টি-প্রণবকে
আবাহন করে নিয়ে আসব কবে!
যেদিন শুধু ক্রোধ নয়,
মানুষের সমস্ত অসুন্দর বৃত্তি সুন্দর হয়ে উঠবে!
সামগ্রিক কল্যাণ-চেতনায় দেবোত্তর হবে মানুষ!!
মহান অগ্নি-মিছিলের পিছনে যোগ দিলাম আমিও
সেদিনকে আনতেই হবে।......

আহুতি

মোর প্রেমে মুক্তি কোথা ? আছে শুধু ব্যথিত বন্ধন
দেহের সমুদ্র-সুধা দুই হাতে নিঃশেষ মন্থন।
যুগ্ম দেহ দগ্ধ করি প্রাণধূপে কামের আরতি।
'পুত্রার্থে ক্রিয়তে' নয়, তবু সতী নিত্য ঋতুমতী !
সৃষ্টির এ চক্রব্যূহ বিধাতার কুৎসিত কৌশল,—
সম্ভোগের সপ্তরথি সব শক্তি করেছে বিকল।
রূপতৃষা বক্ষে তবু নিজহাতে রূপের পেয়ালা
ভাঙিতেছি,—কে বুঝিবে উন্মাদের তীব্র বক্ষজ্বালা !
দুস্তর সমুদ্রপথে একবিন্দু পেয়েছিনু জল
তাও ফেলে দেই আমি কামমত্ত নেশায় পাগল।
তা না হলে মূর্খ আমি মদমত্ত মাতঙ্গের মত
এ দেহ-মালঞ্চ খানি : মধুময় পুষ্প শত শত—
দলে, পিষে ধ্বংস ভ্রংশ ছারখার করিব বা কেন !
কামনার কালিদহে রূপোন্মাদ ঝাঁপ দেব কেন !!

যারে ভালোবাসি তার দেহ চিড়ি বিকৃত বিলাসে
দু'হাতে আহুতি দেই অনঙ্গের অন্ধ অগ্ন্যুচ্ছ্বাসে।
সুধা-সোমে আত্মহারা ; আপনার দেহ-দ্রাক্ষা দলি
ছিন্নমস্তা নর-নারী তৃপ্তি খুঁজি দিয়ে আত্মবলি :—
অধরে-কপোলে-বক্ষে মধুস্যন্দী ফুলের পসরা—
নিবিড়-নিতম্ব-ঊরু, চারুবলি-মোহিনী-অপ্সরা—
দেখে যে মেটে না ক্ষুধা স্পর্শেগন্ধে বাড়িছে লালসা,
উচ্ছৃঙ্খল কামাচারে স্বৈরাচারী মোর ভালোবাসা।
রিরংসার ঝঞ্ঝাঘাতে টলমল্ চিত্ত যে উতলা
নির্লজ্জ বেহুঁশ আমি বক্ষে কাঁদে প্রেম-নীলোৎপলা।

চুম্বন-দংশন-ক্ষত রক্তিমার কুসুম-কপোল,
কামনা-কদর্য হাতে খুলে ফেলি বক্ষের নিচোল—
নিরুপায়, নীবিবন্ধে বেপমান তবু সেই হাত
প্রেমের আকাশে তাই ঘুচিল না কালো-ক্লান্ত রাত।

আমি তো চেয়েছি প্রেম, কাম নয় বীভৎস বিকার
তবুও মিটাতে হয় নিত্য মোরে দেহ-মার-ধার।
আমি তো চাহিনি সৃষ্টি, চাহিয়াছি সৌন্দর্য-প্রিয়ারে
আত্মার উদ্গতি-পথে সর্বত্যাগী যৌবনের দ্বারে—
কবির অন্তরে কবি সর্ব-প্রিয়া আত্মার আত্মীয়া ;
সীমার বন্ধন যত যুগ্মবক্ষে যাব উত্তরিয়া।
যৌবন-সুপর্ণ মোর দেহের ও উন্মুক্ত আকাশে
উড়িতে চাহিয়াছিল সৌন্দর্যের সুস্নিগ্ধ বাতাসে।
অতল প্রশান্ত শুভ্র দেহ-হ্রদে পড়ে মোর ছায়া
তনুর নিবিড় স্বপ্নে ভুলে যাই অতনুর মায়া!
আরক্ত ও পদ্ম দুটি ফুটোন্মুখ পরশ-বিভোল
থরো থরো পত্রপুটে আধো ঢাকা,—সুনীল নিচোল।
অনন্ত রহস্যময় অপরূপ মানসের পারে
দূর বনান্তর রেখা শ্যামস্নিগ্ধ,—মুক্ত কেশভারে।
শুভ্র মেঘখণ্ড যেন মরি মরি ললাট সুন্দর!
প্রাণরশ্মি ছড়াইছে গায়ে তার কুম্‌কুম্ কেশর।
কী যেন পায়নি খুঁজি মেলিয়াছে সুবঙ্কিম ডানা
মানসে পড়েছে ছায়া ; আঁখি দুটি দীর্ঘ টানা টানা,
অধর কপোল যেন শুভ্র মেঘে সোনালী আল্পনা
চিবুকে মিলায়ে গেছে মানসের দিগন্ত ব্যঞ্জনা :—
আমার ও সুন্দর তৃষা মানসের সে মধু-আকাশে
মেলিতে চেয়েছে ডানা বার বার উদ্দাম উল্লাসে—

সে ডানা পুড়িয়া গেছে কামনার রক্তাক্ত শিখায়
সর্বাঙ্গে দারুণ জ্বালা ; ভগ্ন-দেহ মৌন বেদনায়।
প্রেমার্ত এ রুক্ষ মন কোথা পাবে প্রেম-বৃন্দাবন !
কোথা সে পরমা প্রিয়া—মৃত্যুহীন সুতনু যৌবন ?
কোমল, মধুর, স্নিগ্ধ, অপরূপ লাবণ্য প্রতিমা—
বাহুবন্ধে বাঁধি তারে মিথ্যা খোঁজা সুন্দরের সীমা।
কামনা-জর্জর বক্ষে তবু জাগি নিশীথ-বাসর
প্রিয়ার পুষ্পিত দেহে বিঁধিতেছি নখর, কামড়—
নিরুপায় ! তাই চক্ষে ব্যর্থতার তপ্ত অশ্রু ঝরে,
প্রিয়ারে বাঁধিয়া বক্ষে শ্রান্ত দেহে ক্লান্ত পদে চলেছি কবরে ॥

'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'

প্রস্তাবনা : রঞ্জিত শিখর থেকে নীল নীল উচ্ছ্বসিত ফেনায়িত ধারা
নরম সোনালী রোদে কেঁপে কেঁপে গ'লে গ'লে পড়ে।
প্রথম রবির কর কোনো এক অপরূপ আশ্চর্য প্রভাতে
এ বুকেরে বিদ্ধ করে বারুদোষ্ণ রক্তাক্ত রুধিরে।
সিন্ধুর সীমান্ত গান যৌবনের নীল পাখী এসে
অকস্মাৎ একদিন গেয়ে ওঠে গুহার এ অতল আঁধারে।
নীল জল ঝলে ওঠে আপনার মগ্ন চেতনায়,
বিহ্বল বিমুগ্ধ আমি আপনার নার্শিসাসী রূপে !
কালো চোখে কে পরায় আলোকের আশার অঞ্জন !!
'পেয়েছি'র পরিপূর্ণ ছবি
হৃদয়ের সিংহাসনে বসে নিত্য সর্বৈশ্বর্য-সম্রাজ্ঞীর মত।
প্রেমান্বিত যুগলের আমি সাক্ষী রাত্রিমগ্ন অগ্নি তপস্যার—
আমার বুকের রক্তে তাহাদের সংযুক্ত স্বাক্ষর,—
সে পবিত্র ছাড়পত্রে জন্মগত আমিও মহান।
আমি যাব, আমি যাব ঐ শোন সাগরের উতলা আহ্বান
পাথরে পাথরে শুনি প্রত্যাসন্ন মুক্তির ঘোষণা।
পাষাণ-বন্ধন-বিদ্ধ দুর্জয় যৌবনস্বপ্ন প্রত্যাহেরে করে না ভ্রূক্ষেপ
আমার ক্ষুধিত ডানা মুক্তি চায় আকাশের সীমাহীন নীলে।
বিক্ষুব্ধ নির্ঝর খোঁজে মুক্তিপথ কঠিন প্রস্তরে,
বাঁধন ভাঙ্গার স্বপ্নে উন্মাদ যৌবন
অন্ধ বাসনার বেগে আছাড়িয়া গরজিয়া ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ে

আমি : আমারও দুঃস্বপ্ন ছিল আকাশের খুঁজিতে কিনারা,
আমারও একান্ত ইচ্ছা পথে পথে গেয়ে যাব আনন্দের দ্বিধামুক্ত গ
আমার আলোর গানে মুগ্ধ হবে বিপুলা ধরণী।

আমার চলার পথ—দুই তীর ছেয়ে যাব সুধাস্নিগ্ধ সবুজ শ্যামলে
নগরে বন্দরে পণ্য-প্রাচুর্যের প্রসন্নতা মাঠ ভরা সোনার ফসলে,
উড়িবে বিজয়ধ্বজা ঐশ্বর্যের মিনারে মিনারে।
ইচ্ছার মধূখ-দীপে দীপান্বিতা সুস্মিত্রা পৃথিবী
যেদিকে ফেরাই চোখ মুগ্ধ কনীনিকা।
বাহুবন্ধে উচ্চকিতা মধুচ্ছন্দা পুষ্পিতা পৃথিবী ; আমার আমার॥
অহল্যা উষর ভূমি বসে আছে ক্লান্ত চোখে মুক্তি-প্রতীক্ষায়
আমারি প্রাণের শ্যাম মুক্তি দেবে তারে।
এক হাতে সুধাসোম, অন্য হাতে অন্যায়ের দর্পিতের মৃত্যু-পাশুপত,
গড়িতে ডোবাতে পারি,—এই গর্বে বহু আশা স্বপ্ন নিয়ে বুকে
অন্ধগুহা পার হয়ে একদিন পরিক্রমা সুরু
বাস্তবের সীমাহীন সুবন্ধুর পথে।

ক্রমণ : তরঙ্গের অভিঘাতে সমতটে আপনার মুক্তি-পথ খুঁড়ি,—
কিন্তু কৈ পথ কৈ ?
অজস্র মৃত্যুর চর এখানে যে প্রাণপণে মুক্তিপথ দিতেছে পাহারা।
আকাশে সর্বহা বহ্নি শেষ বিন্দু শুষিছে লেহনে
কোথা সে নরম রোদ জ্যোৎস্নার মতন ?
স্বপ্নের শিখর নীলে কোথা সেই সর্বব্যাপী সবুজ প্রত্যাশা ?
উদ্বেলিত স্রোত তবু এ বালুতে আর্তনাদে আছাড়িয়া পড়ে।
বিধূম্র বালুর ঝড়, প্রত্যহের এ সাহারা-সমুদ্রের নির্মম বিস্তৃতি
ব্যঙ্গ করে অট্টহাস্যে আমার স্বপ্নেরে,—
আমার কল্পনা কাঁদে বাস্তবের ধূম্র-নীল রক্তাক্ত এ শ্মশান চিতায়
জ্বলন্ত বালুতে রচে অসমাপ্ত প্রতিজ্ঞার ব্যথিত কবর।
মৃত্যুর মরুতে শুধু পদচিহ্ন পড়ে থাকে নিঃশেষিত শেষ প্রাণধারা।
এমনি অজস্র নদী মধ্যপথে হারায়েছে ধারা
কেহ তার নেয় নি সংবাদ,—

তাদের অস্পষ্ট স্মৃতি আজো কাঁদে উদাসীন মৃত্যু-মৌন সাহারার বুকে।
সহস্র শ্মশান হল,—তবু কৈ মুক্তি-মন্ত্রে আসে ভগীরথ ?...

সংবাদ : এ সাহারা-শুষ্ক-ধূলে তবু শুনি একদিন অকস্মাৎ কলকলধ্বনি—
পাষাণ বন্ধন ভাঙি কারা আসে কলহাস্যে মৃত্যুঞ্জয় উদ্যত কুঠারে
মৃত্যুর তিমিরে কারা প্রাণস্পন্দী সূর্যের শপথ ?
কাহারা তোমরা বন্ধু কুণ্ঠাহীন প্রতিবাদে ছুটিতেছ নির্ভীক জোয়ারে
দুস্তর বালুর পথে আপনার, আগামীর মুক্তিপথ গড়ি ?
আমারও তো স্বপ্ন ছিল, এ শক্তি দুর্জয় মন্ত্র কোথা পেলে বল ?
কোথা এ সংকল্প পেলে সুদৃঢ় কঠিন—
মৃত্যুরে দু'পায়ে দলি সূর্যপথ রচিতেছ এ ধূসরে গাঙেয় সাধনা ?...
আমারে ঠিকানা দাও প্রাণের প্রাচুর্যধারা কোন উৎস হতে
অবিরাম আসিতেছে ? মৃত্যুর সাহারা কাঁপে
মুক্তি-মন্ত্রে প্রাণের ঘর্ঘরে।—
তোমাদের কে সারথি এ সূর্যাক্ত রাত্রির তিমিরে ?
কাহার উদ্দাম চক্রে পার হয়ে এলে এই গিরি-মরু-সমুদ্র কান্তার ?
বল বন্ধু, দাও মোরে সে প্রাণের নিগূঢ় সংবাদ।
আমি প্রাণহীন নদী শুয়ে আছি একপাশে ধূলার কবরে
আশাহীন, ভাষাহীন, স্বপ্নভঙ্গ অর্ধমৃত আমি।

মুক্তি-সেনা : "তোমারি মতন বন্ধু আমাদেরও জন্ম হয়েছিল
অন্ধ এক গুহাতলে। তবু মুক্তি বৈতালিক মোরা
দুর্দিন দুর্যোগ পথে প্রাণবন্ত পদাতিক সেনা—
এ কবরে একদিন ফোটাবই মুক্তির মুকুল।
মুক্তির চেতনা বিশ্বে—আমাদের মহান সারথি
একা নই, বহুর বাহুতে তেজে আমরা দুর্জয়।

জানি বন্ধু! সব জানি তোমাদের সকলের কথা
তোমাদের সব অশ্রু, তোমাদের রক্ত ও ব্যর্থতা,—
দুঃখ-ভরা ইতিহাস—সব জানি। জানি বলে তাই
ঊষর মরুর পথে বেরিয়েছি সিন্ধু-সাধনায়
তোমার স্বপ্নেরে রূপ দিতে। সবুজের জন্ম দিতে
বন্ধ্যা এই মর্ত্য-সাহারায়; তোমার আমার স্বপ্ন
এক হয়ে মিলেছে যে ভাগীরথী সৌর তপস্যায়।
তুমি যা চেয়েছ বন্ধু পাও নাই,—সে স্বপ্ন সুন্দর
আমাদেরও সুপ্ত বুকে একদিন জলে উঠেছিল,
ঘর ছেড়ে করেছে বাহির। সে স্বপ্ন আমার নয়
সে স্বপ্ন সবার—তার প্রাপ্তি সংযুক্ত স্বাক্ষরে—
তার মুক্তি—সে সুন্দর আমাদের সম্মিলিত হাতে।
মানবাত্মা মুক্তির পিয়াসী—তবু করেছিলে ভুল,
যৌবন আলোকে শুধু আপনারে দেখেছিলে তুমি
স্বপ্নের সোনালী রোদে মুগ্ধ তুমি আপনারে নিয়ে।
মুক্তি চেয়েছিলে খুঁজি দেখ নাই মুক্তি পথ কোথা।
শুধু স্বপ্ন চিরকাল জীবনেরে বহিতে পারে না—
একা তুমি কতটুকু কোথা পাবে মুক্তির সন্ধান?
স্বপ্নের শিখর তাই রিক্ত হতে হল নাকো দেরি।
একা কেউ পূর্ণ নয়, সবার সম্মতি নিয়ে তবে
গড়ে ওঠে প্রাণশিশু প্রত্যেকের সাগ্রহ শ্রদ্ধায়।

"একদিন আমাদেরও এসেছিল জাগ্রত যৌবন
সুপ্ত গুহা সচকিত অনিন্দিত আলোর চুম্বনে,—
রেখেছি সমিধ পাত্রে সে যৌবন সঙ্ঘবদ্ধ হোয়ে,—
আমাদের অজস্র যৌবন। ব্যক্তির বিলাসে নয়,
সংযুক্ত প্রাণের যাত্রা আলোকিত তাহারি শিখায়।

মুক্তির আকাশ নীলে নিজ মুক্তি পাখা মেলে দিবে
এ আকাশে, মেলে দিবে এ মাটিতে নির্ভীক অঙ্কুর
স্বাধীন সৃষ্টিরা : তারি পূর্ণ প্রতিশ্রুতি বুকে।
তাই তো নিয়েছি ভার মুক্ত হাতে সরাব জঞ্জাল
বালুর বিশুষ্ক তটে সমৃদ্ধির জলধারা আনি।
আমরা দুর্জয় প্রাণ মরণের তীব্র প্রতিবাদ—
প্রতিজ্ঞার হিমাচল ঐ দেখ উন্নত আকাশে
(সে প্রতিজ্ঞা পৃথিবীর অগণিত মুক্তিকামীদের)
আমাদের মহা উৎস। অনির্বাণ প্রাণধারা তার
মুক্তির সনদ লেখে আমাদের প্রত্যেকের বুকে।
মুক্তি চাও ? যোগ দাও আমাদের সশ্রদ্ধ মিছিলে।
সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিজ্ঞার হে স্বপ্নিক প্রতিশ্রুতি দাও,
আমাদের মত হবে তুমিও দুর্বার। আমাদের
সঙ্গে চল খুঁজে পাবে সুনিশ্চিত সিন্ধুর সন্ধান।
সর্বমুক্তি ছাড়া আর ব্যক্তি-মুক্তি কখনো হবে না—
এ কথা বুঝিবে কবে ? এস আজ মুক্ত হাতে এস
নতুন আঘাত হানি সঙ্ঘবদ্ধ শত্রুর শিবিরে।
শুভ্রতার ছদ্মবেশে ওরা হিংস্র শাণিত বর্শায়
তরুণ প্রাণেরে নিত্য বিদ্ধ করে উদ্ধত উল্লাসে।
চারিদিকে গুপ্ত শত্রু, ঐ দেখ করিছে লেহন
সর্পিল বিষাক্ত জিহ্বা, পথে পথে মেলিতেছে থাবা।
আমাদের এত খুনে তৃষ্ণা বুঝি মিটিল না আজো
রক্তলোভী পরজীবী ওরা। এবারে শপথ নাও
আর রক্ত দেব নাকো ; যদি আসে ডোবাব বন্যায়,
মৃতেরে কবর দেব সম্ভাবিত প্রাণের শ্যামলে।"
ঘোষণা : "মাদল বাজাও বন্ধু, উচ্চকিত প্রাণের মাদল
মৃত যারা পঙ্গু, ভীরু; অসহায় তারাও জাগুক ;

দু'হাতে ছড়াও পথে মৃত্যুনাশা মুক্তির বারুদ
আছাড়িয়া ভেঙে পড় উন্মত্ত উল্লাসে—পথ কর,—
আপনার মুক্তি-পথ ধূসরের বুক চিড়ি ফাড়ি—
বালুর ফসিলে আন মৃত্তিকার নব অভ্যুদয়।
সহস্র সগর-শিশু কাঁদিতেছে মুক্তি-প্রতীক্ষায়
আর্তস্বরে গুমরিছে ঐ শোন করুণ ক্রন্দন।
প্রাণপণে ছুটে চল ঐ আসে উদাত্ত আহ্বান।
যেতে হবে বন্ধু যেতে হবে, সমুদ্র সীমান্ত থেকে
আনিবই অলকনন্দারে—এই মর্ত্য পৃথিবীর পথে।
তোমারও তো আছে প্রাণ এস বন্ধু করতালি দিয়া
ডাক দাও যেখানে যে আছে। আমরা প্রচণ্ড হব
শত্রুর সহস্র বাধা চূর্ণ হবে বিদ্রোহ বন্যায়
ঐরাবত ভেসে যাবে মেঘমন্দ্র বিক্ষুব্ধ গর্জনে—
ওদের বালির বাঁধ ভেসে যাবে তৃণখণ্ড সম।......
প্রাণের পবিত্র শীষ চোখ মেলে চাহিবে মরুতে।
শুভ্র শঙ্খনাদে শোন ঐ বুঝি ভাগীরথী আসে
এই পথে; তোমার আমার হাতে মুক্তি-গঙ্গোদক।
জীবনে স্বপ্নেরে চাও! অন্য পথ নাই পালাবার
একা কারো মুক্তি নাই বন্ধু এই হিংস্র পৃথিবীতে।"

আমি যাব আমি যাব আমারেও নাও বন্ধু তোমাদের দলে
সমুদ্র-তপস্যা আনো সুপ্ত এই বুকে
এই মৃত্যু থেকে মুক্তি দাও।

আশ্চর্য! এ কি এ হল ফিরে দেখি আমিও দুর্বার:
মূর্চ্ছিত বালুকা-বেলা ঢেকে গেল সদ্য-জাগা প্রাণের সংবাদে,
আমার বিশুষ্ক ধূলে তরঙ্গিত আষাঢ়ের কূলপ্লাবী উন্মত্ত প্লাবন,—
বালির বিচূর্ণ বাধা ভেঙে পড়ে খরধারে আমার সম্মুখে।

আমার বিদ্যুৎ প্রাণ উদ্বেলিত অগণিত জনতায় মুষ্টিবদ্ধ হাতে
সহস্র চোখের নীলে নীল-ধারা উত্তাল উদ্দাম।
আমার প্রাণের পথ এতদিনে খুঁজিয়া পেলাম,—
যৌবনের জয়োদ্ধত আমি
আবার আমার যাত্রা সুরু হল—সমুদ্র সাধনা
এতদিনে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হল।
—"সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি" ॥

মা

এই তো সেদিন ভোর বেলার রূপোলী রোদ্দুরে
খোকা কেঁদে উঠল আমার কোলে,—
উনি দেখতে এলেন জব্বলপুর থেকে।......
দেখলাম খোকা হাঁটতে শিখেছে
নড়বড়ে বাঁকা পায়ে আছাড় খায় বার বার,
রেখাঙ্কিত নরম পায়ে রুনুঝুনু করে নূপুর।.........
দেখলাম ওকে খেলার মাঠে হাফ্‌প্যাণ্ট্‌ পরে'।......
দেখলাম ওর গোঁফদাড়ি বেরিয়েছে কালো রেখায়
গলার স্বরটা হয়েছে একটু ভারী।
মোটা মোটা বই পড়ে
অনেক রাত অব্‌দি মাথা নীচু করে কী লেখে,
কলেজ থেকে ফিরে এসে আর ঘরে থাকে না প্রায়ই।
জানালায় মুখ থুয়ে কি ভাবে।.......

তারপর একদিন হঠাৎ দেখলাম বিছানায় শুয়ে,—
জ্বর হয়েছে :
ছট্‌ফট করছে যন্ত্রণায় ......চোখ বুজে আসে......
আমি চেয়ে থাকি সজল চোখে।
ডাক্তার এল, কবরেজ এল—এল পাড়া প্রতিবেশী,—
উনি সংবাদ পেয়ে যখন এলেন
কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া উঠছে ভিজে শ্মশান থেকে ;
বাইরে তখন শ্রাবণ বর্ষার সহস্র-ধারা।
উনি এসে দাঁড়ালেন আমার কাছে :
কি বললেন আমার কাঁধে হাত রেখে,—মনে নেই। ..
উনি চলে গেলেন,—দেখলাম তাও।

আজ আবার আকাশে সেই রূপোলী রোদ্দুর—
দূরের আকাশ থেকে ভেসে আসে শঙ্খচিলের ডাক,.......
হাঁসগুলো ডুবে ডুবে শামুক তুলছে
সাদা পাখায় গড়িয়ে পড়ে পদ্মদীঘির কালো জল।
পুকুর পারে গুলতি খেলছে ছেলেরা
তার অস্পষ্ট কলরব ভেসে আসছে এখানেও।
ফেরিওয়ালা হাঁক দিয়ে ডেকে যায় -ঝুনঝুনি বাজিয়ে···।
সবাই আছে,--আছে সেই আকাশ, সেই বাতাস :
গাছের মাথায় ঝিকমিক করছে সেই রূপো রোদ,
চোখের কোনে জল।
শুধু খোকা আজ নেই ॥

স্বর্গভ্রষ্ট

"Man is born free but everywhere he is in chains."

নরম মোমের মত ভেলভেটি দেহ তার
পেয়ালায় ভরা ভরা এক ঝাঁক কাঁচা সোনা রোদ
তৃষ্ণার্ত পথের মাঝে একদিন দেখা হল বিস্মিত বাসরে,
বড় শ্রান্ত, প্রাণ ভরে দেহ ভরে একটি চুমুক,—
মনে হল ধন্য আমি। কাঁপা কাঁপা নীল-স্বপ্ন চোখের ডগায়,
কুঁড়ির কাকলী নীড়ে প্রাণময় নরম বিদ্যুৎ—
রূপোলী আকাশে চুল সুনিবিড় ঝাউয়ের ঝিমেলি
হাতে ফুল, বুকে ফুল, ফুলে ফুলে ফুলের পসরা।
বিভ্রান্ত নাবিক যেন, সদ্য জাগা এক ফালি সবুজ সীমায়—
একটু আততি যেন রাত্রিশেষে নগরীর নীরব চত্বরে।
গনগনে বয়লারে সারাদিন খেটে
দুই হাতে প্রাণপণে শ্বাস নেয়া যেন বুক ভরে,
কেবল ফ্যাক্টরী থেকে বার হয়ে খোলা মাঠে উঁচু হাত তোলা।
সম্মুখ শিবিরে যেন সদ্য-আনা রেশনের পেটি
বড় ক্ষুধা দগ্ধ তৃষা ; ৭ দিন ১০ দিন খাইনি যে কিছু।
খুশী হয়ে যাত্রা করি,—অনাদ্যন্ত বিরাট মিছিল—
আর দেখি আপনারে পিছু পিছু পাশে পাশে আর একজন,
একটি পর্দার পিছে থরো থরো উদ্বেলিত সমুদ্র নিঃসীম—।
সে সমুদ্র, সে আকাশ একান্ত আমার
প্রবালে মুক্তায় আর হাসনুহানা গন্ধে ভরপুর :
সেখানে নিঃশ্বাস নিয়ে বাঁচবে আমার সত্তা দ্বিধাশূন্য উন্মুক্ত গাহনে।
মিছিলের একজন এই গর্বে পার হই মাঠ-নদী-সমুদ্র-পাহাড়
প্রত্যাহের পুঞ্জীভূত কত শত সুবন্ধুর পথ,
একা নই, ধন্য আমি ওঁ তৎসৎ।

সেদিন চৈতালী রাত পূর্ণিমাই কিম্বা কাছাকাছি—
আকাশ-পেয়ালা থেকে উপ্‌চে পড়ে মৃত্যুগন্ধী মাতাল মদিরা,
চুম্বন-উন্মত্ত ঠোঁট কেঁপে ওঠে, জ্যোৎস্নায় আগুন !
ফুলের পাপড়ি-ঝরা—বলিরেখা সময়ের আকুঞ্চিত থাবা
আঁচড়, কামড় আর সে চোখের নীল দীপ নিভে গেছে কবে !!
শেষ বিন্দু চুষে গেছে আফ্রিকার রক্তভুক্ এক ঝাঁক ক্ষুধার্ত বাদুড় :
নিশুক্ক বিশীর্ণ দেহ গ্রন্থীহীন লোলচর্মে কুৎসিত বিকৃতি
কোমল পীনস্ক তনু শীতরিক্ত, নিঃশেষিত, স্বেদাক্ত শিথিল ।
বিষাক্ত রাক্ষস যেন চেটে গেছে তার ঘৃণ্য লালার লিপিকা—
চৈনিক ড্রাগন তার নাসারন্ধ্রে স্ফুলিঙ্গ উদ্গারে···
নখরের তীক্ষ্ণ চিড় । কেবল-শিবির-তোলা যুদ্ধান্তের ছিন্নভিন্ন গ্রাম
সবুজের শেষ চিহ্ন মুছে গেছে বুটে আর রক্তাক্ত বারুদে—
নিটোল সবুজ দেহ পিষে গেছে, ছিঁড়ে গেছে বুটের তলায় ।

হে কাল, হে মহাকাল, হে নিষ্ঠুর কুণ্ঠাহীন কাল !
এ ফুল মাড়িয়ে যেতে এতটুকু লাগেনি তোমার ।
তুমি বুঝবে না কিছু হে ঈশ্বর ! আমার ক্রন্দন আর আধ্যান বিক্ষোভ,
কেন দিয়ে নিয়ে গেলে—সেই শান্ত নরম মেয়েটি—
মিষ্টি রোদের মত রাত্রিশেষে পথশ্রান্ত মাঘের সকালে
শীতের কামড়ে কাঁপা দেহে লাগে পশমী আরাম ।
সে প্রশান্ত কালো চোখে ঝল্‌মলে পথের প্রদীপ
বুকের অতলে খোঁজা পথে পথে এ ক্লান্তির একটু নির্বাণ ।
হে বাল্মীকি ! তুমি শুধু রচনায় আপনার অমরতা খোঁজো—
এ মহৎ রামায়ণে শিল্পীর বিবিক্ত নিষ্ঠুরতা ।
ব্যবহারে গেছে ধার, খরধার চঞ্চল নদীটি—
আজ তার ক্ষীণ স্রোতে সময়ের পঙ্কিলিত মেদ আর মৃত আবর্জনা ।
প্রত্যহের পঙ্কবিদ্ধ হে অনীহ আপনারে মুক্ত করি কোন প্রস্রবণে ?

ফুরায়নি বনবাস ; স্ত্রৈণ পিতা অঙ্গীকৃত আযৌবনা প্রকৃতির পায়ে
স্বর্গচ্যুত বনবাসী আমরা যে ইভের সন্ততি।

আলোর পল্লবে আঁকা আহা সেই রেশমী মেয়েটি
আজ সে কোথায় গেল কোন ক্রুর পুতনার ক্লেদাক্ত গহ্বরে ?
কাঁদে কাঁদে ; শূর্পণখা রাবণেরে দিয়েছে সংবাদ
পঞ্চবটী শূন্য হল—পঞ্চেন্দ্রিয়-পথে-পথে জটায়ুর করুণ পালক।
স্বর্ণলঙ্কা কত দূর ? ঠিকানা জানি না। বন্ধ সূর্যাংশুক-অশোক-বনে
রাবণের দস্যু-রথ কোন শূন্যে নিয়ে গেছে সীতারে আমার !
উদ্ধারের আশা নেই রথচক্রে নিষ্পেষিত আমার নিষ্ফল আর্তনাদ.
কেয়ূর-কঙ্কন ধরি হাহাকার, বাহুবন্ধ সীতার খোলসে—
ব্যাভিচারী সময়ের আশ্লেষিত উচ্ছিষ্ট সে সীতা।

তৃতীয়ার তন্বী-চাঁদ আশা দিয়ে অন্ধকারে জাগিলই যদি
আবার নিভল কেন ? কোন শিল্প-প্রয়োজনে কঠিন মেঘের অন্ধকারে ?
বন্ধ কর জন্ম পূর্ব রামায়ণ-রচা—হে নির্মম হে দস্যু বাল্মীকি !
কণ্টক বন্ধুর পথে চিরকাল তৃষ্ণার তিমির
চাওয়ার নির্বাণ নেই প্রাপ্তি পথে সীমাহীন সমুদ্র মরুভূ।
কৃষ্ণপক্ষ-জীবনেরে বৃথা কেন ব্যঙ্গ কর এ মেঘাভ্র ক্ষণিক বিদ্যুতে ?
তার চেয়ে ভাল ছিল চিরন্তন অন্ধকার !
হারাতে হত না কিছু কিছু না পেলেই,
ভাবতাম, আমরা এক বীভৎস রাজ্যের অধিবাসী
কোন দুঃখ ছিল নাকো ; আমাদের স্বৈরাচারী বিধাতা সম্রাট।
চলার বিমুক্তি হত মৃত্যুর অতল তলে ! ক্ষোভ ছিল নাকো।

এর চেয়ে ভাল ছিল চিরকাল স্বপ্ন নিয়ে রুদ্ধ পঙ্কিরাজে…
দেখা দিয়ে মধ্য পথে মধুমালা মিলাত না অপ্রাপ্তির বেতস-গুণ্ঠনে।

আমার স্বপ্ন-তৃষা চিরকাল থাকত সে অপুষ্পিতা অক্ষত কুমারী
লবকুশ কে চেয়েছে ? বিপ্রলব্ধ আমি আজ বিধাতার বিমুক্ত বাসরে।
আমার আহত কণ্ঠে,সূর্যবংশ রাজপুত্র—তবু ঝরে ম্লান দীর্ঘশ্বাস
কোথায় সে রূপকন্যা—কি দেখেছি কোথায় সে গেল !

কল্যাণী-কংগ্রেস, ১৯৫৪

সেদিনও এমনি ছিল এই পথ—এই জনপদ :
এমনি আকাশ-কাঁপা আদিগন্ত সোনালী গরদ,
অনেক ওপরে নীল—নীচে ছিল নরম সবুজ।

ওরা যে অবুঝ----
রোদ-বৃষ্টি-জল-ঝড়ে নিত্য চলে পদাতি মিছিল,
শীতে জমে, রোদে গলে, উঁচু নীচু আঁকাবাঁকা পথ যে সপিল—
তাও জানে তবু,
সেই থেকে একদিনও থামে নাই কোনো কাজে কভু
করেছে বিশ্বাস তীর্থঙ্কর মহান জনতা
মধ্যাহ্নের মোহ নাই, দু'পায়ে নিষ্পিষ্ট করি রাত্রির জড়তা।

কান পাতি শোনে
পাঁচে ও পঞ্চাশে এই ঊষর মাটিতে কারা কত বীজ বোনে!
ভাবে! ভোর হবে ঐ পূর্বাকাশ হল বুঝি লাল ;
নির্ভীক মশাল
বহু পথ পাড়ি দিয়ে, বহু হাত ঘুরে ঘুরে
একুশ-তিরিশ হয়ে বিয়াল্লিশ - পয়তাল্লিশ এসেছে অনেক দূরে
তাই,
অবশিষ্ট শক্তি বুঝি শুষ্ক হাড়ে এতটুকু নাই।
তবু কী উৎসুক আজো! তিনরঙা রামধনু সূর্যের
দিতে পারে নব দৃষ্টি অসহায় প্রাচীন অন্ধের!
মৃত্যুর মতন শান্ত ধৈর্য-নিষ্ঠ হে অক্লান্ত স্বদেশ আমার :
মঠ-মাটি ক্ষেত-কল মজুর-খামার---

দরিদ্র ব্রাহ্মণ-শূদ্র, চাষী জেলে, তাঁতী-মুচি, কুমার-কামার!
আজো স্বপ্ন ঘুচিল না তার !!

রুগ্ন দেহ, ম্লান চোখে অবসন্ন অসীমে বিস্তৃতি
উদগত পাঁজরে কণ্ঠে তবু কী আশ্চর্য জ্বলে নিষ্ঠার নিবীতী।
—সেই একই পথ ধরে আজো খোঁজে স্বর্ণ-স্মিতা কল্যাণী কোথায়?
গ্রাম গ্রামান্তর থেকে দলে দলে যায়
বিন্ধ্য থেকে হিমাচল,
কাবেরী-যমুনা-গঙ্গা উচ্ছলিত-তরঙ্গ-জলধি— ;
অসম্ভাব্য সেই 'যদি' দোলা দেয় তবু নিরবধি।
নিতান্ত নিরীহ মেষ-জীবনের ভীতি
অদৃষ্টের হাল ধরে ক্ষেরুপাল-দিন গোণা নিরুপায় শুধু
উচ্চকার সমুদ্র কাঁদে,—প্রবঞ্চিত শূন্য মাঠ করিতেছে ধূ ধূ।
প্রাচীন পাথর সিঁড়ি
দুরন্ত শক্তির ডানা কিছুতেই মেলে না এ পাণ্ডুর আকাশে,
স্বাধীন কোকিল এর দিগন্ত-বাতাসে
দেয় না কখনো ডাক। তাই চোখ বুজি
আঁধার-আবর্তে ঘুরে শেষ করে ক্ষীয়মান জীবনের অবশিষ্ট পুঁজি।—
অনায়াসে ধরা দেয় স্বর্ণলোভী গৃধ্নু তার নির্মম ফাঁকিতে
রঙে আর রায়বেঁশে নব নব রক্তিম বুলিতে
ধাঁধায় করুণ চোখ তিনরঙা রামধনু ;
মরীচির মোহ নিয়ে আজো ছোটে তৃষ্ণাঞ্জলি আশা ভরে নিতে!

ছিয়াশির যৌবনেরা সুনিঃশেষে আটাশে তেত্রিশে
গেছে নিভে—কঠিন ধূলার সাথে মিশে।
নির্মম শ্মশান থেকে তবু এ দেশের এক সর্বত্যাগী যাযাবরী উন্মাদ যৌবন
দিনে রাতে সকালে সন্ধ্যায় অনুক্ষণ
সড়কে সড়কে বহু অনেক অনেক সিঁড়ি পার হয়ে হয়ে
এসেছে দুর্বল ঘাড়ে শুধু মাত্র ব্যর্থতার রিক্ত বোঝা বয়ে।

সোনার স্বপনে ঘেরা সাতচল্লিশ, পঞ্চাশ সাল—
প্রতিশ্রুত কৈ সে সকাল ?
ভদ্রদের কলাকীর্তি ফ্যাল ফ্যাল দেখে,
বাজী ও রোশনাই কিছু আশে পাশে চেখে
বাবুদের পিছে থেকে বহু দুঃখ ব্যথা পেয়ে প্রশ্ন শুধু 'বেশ, তার পর' !
মহামারী, মন্বন্তর গেল কত ঝড়—
ঘর-বাড়ী পুড়ে গেল, ধান গেল, মান গেল, তবু সেই ক্লান্ত তারপর।
ধূসর পিঙ্গল বুকে, ক্ষীণ হাতে কিছুতেই নামিল না ঝড়—,
যে ঝড়ে সম্ভব হত নতুন জীবন আর নতুন মানুষ—
মাঠে ধান, মুখে হাসি। আলোতে ধাঁধায় চোখ আমরা বেহুঁশ।
ওঠা বসা একাকার এদেশের মুমূর্ষু গণেশ
কুৎসিত বিকৃত দেহ আহত রক্তাক্ত হল,
তবু স্থির স্থাবর এ দৈবিক জনতা।
পঁচাশির পৌত্র আর অতিবৃদ্ধ প্র-পৌত্রেরা
টেনে টেনে পথ চলে—দীর্ঘ এক মগ্ন নীরবতা—
জরাগ্রস্ত জীবনের ভগ্নাংশিক ছিন্নভিন্ন টুক্‌রো কতগুলো
হাত ধরে শিশু নারী অগণিত উদভ্রান্তির তরল আশ্বাসে ;
শ্রান্ত পায়ে ছিয়াশির ধূলো।
ঘোলা চোখে বোবা প্রশ্ন,—শান্তি-দীপা কল্যাণী কোথায় ?
দিনে রাতে সকালে সন্ধ্যায়
চুয়াল্লোর ক্ষয়া পথে দলে দলে পালে পালে ওরা যায় যায়
কে জানে কোথায় ?

আবার ক্যালভারী

[কোনো কৃতান্ত গুণীর সাহিত্য-পুরস্কার প্রাপ্তি উপলক্ষে]

মহান্ মৃত্যুতে নীল সেদিনও এমনি ছিল বিষণ্ণ আকাশ
থরো থরো মেদুর বাতাস !
মানুষের পশুকীর্তি সেই তো প্রথম
কী ছিল প্রতিজ্ঞা ভুলি লজ্জা ও সম্ভ্রম,
বিচারের ছদ্মবেশে হিংসামত্ত মূঢ়তার ব্যর্থ প্রহসনে
বসি সিংহাসনে
অশুচি নখর-দন্তে সুন্দরের শুভ্র তনু বিদ্ধ করে উৎকট উল্লাসে,
দলবদ্ধ শ্বাপদেরা উচ্ছৃঙ্খল চারিদিকে খলখল হাসে।
অপমানে, নীচ নির্যাতনে
আত্মার আনন্দ গেল কণ্টক মুকুটে ক্ষত মৌন নির্বাসনে।
আসন্ন রাত্রির ছায়া রোমাঞ্চিত সাম্রাজ্যের স্বর্ণ-উপকূলে—
কি এক আশঙ্কা যেন কেঁপে ওঠে, ওঠে ফুলে ফুলে
গোপন ব্যাধিতে ক্ষীণ, অবক্ষত পঙ্কিল পাঁজরে ;—
মৃত্যুর বাদুড় বুঝি ডানা মেলে। শেষ শয্যা মুমূর্ষু প্রস্তরে
অর্থহীন ইতিহাস নির্মম মাটির তলে,—ক্ষয়ে ক্ষয়ে যায়
কীর্তিনাশা কালের বর্ষায়।
তবুও কেমন করে অন্ধকারে চুপি চুপি হামাগুড়ি দিয়ে
বৃত্তপথে যুগান্ত পেরিয়ে
ক্লেদাক্ত পিচ্ছিল থাবা উঁকি দেয় একালের আলোর গহ্বরে :
বিদ্যুৎ সর্পিল জিভে লুব্ধ লালা ঝরে,
ফেনিল আবর্ত জাগে ক্ষীয়মাণ সাম্রাজ্যের সর্বনাশা নেশা—
অস্ত্রের অশনি, বর্ম, পদাতিক, ক্ষিপ্র অশ্বহ্রেষা—
সেই একই অন্ধবৃত্তি আসমুদ্র দিতেছে পাহারা।
আবার এসেছে উঠি পিলাতের জ্ঞাতি-গোষ্ঠী জুডাস্-কায়ফারা

আবার নিয়েছে তুলি কলুষ-পঙ্কিত হাতে বিচারের ন্যায়দণ্ড, তাই
অন্য পথ নাই
কুৎসিত গর্দভ-পৃষ্ঠে বাণী আজ ম্লান রিক্ত ক্যালভারীর পথে।
কাব্যের বিজয়-মালা বর্শাবিদ্ধ দস্যুতার রথে॥

মানুষের উষ্ণ রক্তে কলঙ্কিত—এখনো যে হাতে
লোভের মশাল জ্বলে, অন্ধকার রাতে
গোপন লুঠের ধন—বৃত্তি যার চিরকাল বীভৎস দস্যুতা,
হিংস্র পদতলে যার বিদীর্ণ পৃথিবী কাঁদে মন্বন্তর-মহামারী ক্ষুধা—
নতুন চেঙ্গিস ; যারা নির্বিচারে করিতেছে খুন।
নির্লজ্জ উন্মাদ হয়ে শান্তির কুটিরে যারা অট্টহাস্যে ছড়ায় আগুন।
পঞ্চাশ লক্ষের কথা মনে পড়ে আজ ! সেই ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাস
শ্যামল সোনার দেশে। আরও কত অজস্র পঞ্চাশ :
বন্য বর্বরতা যার মালয়ের উপকূলে কেনিয়ার গভীর জঙ্গলে
রক্তের আগুন জ্বালে ইরানে সুদানে।
জান্তব-আক্রোশে যারা অকারণ মানুষেরে হানে।—
বিদ্যার মণ্ডপে আজ সে দানব এসেছে সে অশুচি মাতাল
—মত্ত বেসামাল।
সমাজ ও সভ্যতার সব সিঁড়ি ভেঙে যারা করে ছারখার
তারি হাতে সাহিত্যের উত্তরাধিকার ! হুঁশিয়ার বন্ধু হুঁশিয়ার !!
শূন্য এ দেউলে আজ তারি হাতে ছিন্ন দীপ জ্বলে,
তুলিতে মসীতে নয়, বাণীবিদ্যাপীঠও ওরা অধিকার করেছে সবলে।
শাণিত প্রহরী খাড়া সেখানেও অস্ত্রের ঝনঝনা
শোণিতার্দ্র ঘৃণ্য হাতে বাণীর বন্দনা।

তবু বন্ধু মনে রেখ 'দানবের মূঢ় অপব্যয়
গ্রথিতে পারে না কভু ইতিবৃত্তে শাশ্বত অধ্যায়'।

আরো এক ইতিহাস মহাকাল করিছে রচনা
তোমার আমার রক্তে শুনছোনা সে উষার স্বাগত-মূর্ছনা !
সময়ের শমীবৃক্ষে বিনিদ্র প্রহর জাগে ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী
কখন প্রভাত হবে ?—এ রাত্রি কখন হবে মিশরের মমী—
এ হিংস্র নখর দন্ত সেই একই পথ ধরে দুর্বোধ্য ফসিল ?
সে ঝড় আসন্ন বুঝি চক্রপথে ওড়ে তাই ভীত ত্রস্ত চিল—
হে শিল্পী সাধক বন্ধু ! তোমার বীণার তারে সেই ঝড় প্রত্যাসন্ন কর
যে যেখানে নেমে এস দীপক-মল্লার আজ একসাথে ধর,
বাজাও, বাজাও বন্ধু দুই হাতে প্রাণপণে,—নির্ভীক ঘোষণা।
যতদিন না আসে সে ঝড়
ছড়াক বিষাক্ত বায়ু এ বাতাসে, ততদিন রাসভের দীর্ণ কণ্ঠস্বর !
নিজ হাতে খুঁড়ে যাক আপন কবর
সে লুব্ধ বর্বর ॥

হাড়

"Fertility of soil depends on phosphate and a good percentage of it comes from human bones and skulls."

সৃষ্টিশীলা ধরিত্রীর পত্রেপুষ্পে শ্যাম শষ্পভূমি
আমারি আনন্দ সৃষ্টি,—পরিত্যক্ত দেহ মোর চুমি'।
ধূলিমুষ্টি তুলেছ যে কৃষ্ণকান্ত নরম কোমল,—
মানুষেরই অস্থিচূর্ণ আত্মদানে সৃষ্টি রসোজ্জ্বল।
দগ্ধ অস্থি চূর্ণ করি মেদ, মাংস, রক্ত, মজ্জা দিয়া
যুগে যুগে সৃষ্টিক্ষমা এ মৃত্তিকা নিয়েছি গড়িয়া।
আপনারি অস্থিদানে পৃথিবীরে মানুষ দধীচি
রাখিয়াছে সু-সাবিত্রী করি। আপন অস্থিতে রচি
সৃষ্টি-বজ্র দুই হাতে মৃত্যুবক্ষে মারিতেছে তুলি—
নিয়ত সংগ্রাম তার মৃত্যু সাথে আপনারে ভুলি।
ফুলে-ফলে, পত্রে-পুষ্পে নৈবেদ্যের থালা নিয়া করে
পঞ্জর-প্রদীপ জ্বালি প্রাণমন্ত্রে আরতি সে করে।
মানুষের সাদা হাড় ভূমিগর্ভে আজিও ঘুমায়
সৃষ্টি-স্বপ্নে এ মাটিরে জাগাইছে চুমায় চুমায়।
ঐ যে ফুটেছে ফুল মধুগন্ধা রজনীগন্ধার
স্নিগ্ধ শুভ্র কুঁড়ি নিয়া ভেদ করি গর্ভ মৃত্তিকার—
মানুষেরই সৃষ্টি-ইচ্ছা ওখানেও মেলিছে অঙ্কুর,—
রসের নির্যাস্কী ঐ শ্বেত-শুভ্র দগ্ধ অস্থিচূর।
শ্মশানের দগ্ধদেহ হবিগন্ধ অরুণ উচ্ছ্বাসে
বিলাইছে ফুলে ফুলে অপরূপ মাধুর্য সুবাসে।
আমারি সহস্র প্রাণ হেমন্ত-শিশির-বৃষ্টি সাথে
সোনা ধানে পূর্ণ হয় শরতের জ্যোৎস্নাভরা রাতে;
ঊর্ধ্বমুখী শস্যশিশু ধান্যশীর্ষে উন্মুখ ডানায়
বেড়ে ওঠে আমারি তো চন্দ্রঝরা প্রাণের ধারায়।

ঐ যে অজস্র ফুল—কৃষ্ণচূড়া পলাশের ডালে
রক্তোচ্ছ্বাসে ফুটিয়াছে,—হয়ত তা হৃৎপিণ্ডতালে
রক্ত হয়ে প্রবাহিত পিতৃপিতামহদের দেহে।—
উত্তর পুরুষ লাগি রেখে গেছে ভূমিগর্ভে স্নেহে।
প্রেয়সীর কণ্ঠে পুত্র তুলে দিল পুষ্পমালাখানি
যাহার বিহ্বল গন্ধ দেয় তারে প্রেমস্বপ্ন আনি,—
সে গন্ধ হয়ত ছিল মধুকোষে আপন পিতার
হয়ত সে মেদগন্ধ দগ্ধ-দেহ জ্বলন্ত চিতার—
পিতারই শ্মশানভস্মে নিয়েছে সে সঞ্জীবনী রস
পঞ্চাঙ্গুলি শিকড় সঞ্চারি। পুষ্পপ্রিয় এ পরশ
সুপ্ত ছিল পিতৃদেহে সুমধুর শৈশব-হরষ।
প্রেমের মন্দিরে মোর আরতির গাথা-মন্ত্র-স্তবে
স্মৃতিরে রেখেছি আমি নিত্য নব বসন্ত-গৌরবে।

আমি চলে যাব জানি, তবু মোর রহিবে যে বাণী
আমারি ধরার বক্ষে। শিশুর যৌবন-চিত্তখানি
প্রেমরাগে রাঙাইবে মেঘে মেঘে মেদুর অম্বরে,
আরো মধুপূর্ণ হবে অনাগত প্রিয়ার অন্তরে।
গোবিন্দের গীত নয় সে আমার আপন সঙ্গীত
প্রেমোৎসবে পূর্ণ হবে মানুষের জীবন-চরিত।
পূর্বজের প্রেমস্বপ্ন তাহারো অন্তরে দিবে দোল
মোর গান তার কণ্ঠে পুষ্পছন্দে প্রস্ফুট বিভোল।
আমার যা প্রীতি, প্রেম রেখে যাই বংশজের লাগি
অনুরাগ-রক্ত দিয়া কাব্যে গানে দীর্ঘ রাত্রি জাগি।
মৃত্যুর সর্বাঙ্গ 'পরে জড়াইয়া স্মৃতি-নামাবলী
নত নেত্রে ন্যস্ত দেহে আমি যাই ক্লান্ত পদে চলি।

কৃষ্ণচূড়া

এমন আশ্চর্য কাব্য এ সংসারে লিখেছে ক'জন ?
উদয়-সমুদ্র চেয়ে একবার লিখেছিল কীট্‌স
ছাব্বিশের সিংহদ্বারে জীবন-মৃত্যুর মুখোমুখি,—
এ জাতক-জীবনের সোনা-অর্ঘ্য থালায় থালায়।
মৃত্যুর গোধূলি-লগ্নে মন্দ কবি-যশ-প্রার্থী আমি
ছাব্বিশের স্বপ্ন মোর ভরে যাই রক্ত-ঝরা সোনার ফসলে।

প্রাণের পরমবাণী সবটুকু অনুভব—সুনিঃশেষে বলা
ছন্দের নিগড় নেই, বাণীও তা অর্থহীন এক পাশে পড়ে।
অশ্রুত জীবন-ছন্দে মহাকাব্য সোনার মুকুটে
অবিরাম ছোটে শুধু পায়ে পায়ে মুক্ত করে দিয়ে
সব অর্থ সপুর্ণি এ জীবন ভাগ্যের ;
রক্ত পঙ্ক্তিরাজে মোর আশ্চর্য এ রক্তাক্ত কবিতা।

কৃষ্ণচূড়া কাব্য এ আমার
শুধু ফোটে স্তূপে স্তূপে অফুরাণ অধরের নীলবৃন্তে ফোটে।
বসন্ত কখন গেল, কোকিলের কণ্ঠস্বর কবে গেছে থেমে ;
তবুও অজস্র ফুল ফুটিতেছে হৃৎপিণ্ড মাটিতে আমার
সূর্যাস্ত সীমান্ত সম লাল শুধু লাল।
বুকের না-বলা কথা এমন সহজ হয়ে রক্তছন্দে মুখে মুখে ঝরে
কাগজ কলম নেই, শব্দহীন,—তবু যেন সব হল বলা।

কালির আখর যেন সোনা হয়ে অনির্বাণ শুধু
বুকের বক্তব্য নিয়ে ঝরে পড়ে ওষ্ঠে ও অধরে :
প্রথম প্রেমের মত কেঁপে কেঁপে ওঠে—
প্রথম চুম্বন যেন লাল ঠোঁটে বাসর-শয্যায়—
আশ্চর্যের অনুভবে সর্বদেহ শিহরিয়া যায়।

দিনের উদ্দীপ্ত আশা সন্ধ্যাকাশে লাল হয়ে দিগন্তে মিলায়,
আমারো সহস্র ইচ্ছা অসমাপ্ত রক্ত হয়ে ঝরে।
যা পেয়েছি, পাই নাই, চেয়েছি যা যৌবনের স্বপ্নের মিনারে :
আশার অসীম রাজ্যে পক্ষিরাজে রাজপুত্র আমি
স্বপ্নলোকে কতবার ছুঁয়ে গেছি ঘুমন্ত জানালা ;
একান্তে স্তিমিত দীপে ঘুমাইছে রাজবালা সৌন্দর্যের স্বর্ণ-শয্যা 'পরে
ভাঙাতে পারিনি ঘুম, সোনার সে কাঠি পাব কোথা ?
আজ সব ব্যর্থ ভাষা জীবনের সেই সব অতীত অধ্যায়
ইচ্ছার সোনালী রোদ ঝক্‌মক করিতেছে হৃৎপিণ্ড-রক্তের সোনায়।

সহজ সরল কাব্য, আভরণ অলঙ্কার কোথা এর এতটুকু নেই
জীবনের অনুষ্টুপ্, তবু যেন বাজে এর সুরে :
কোন ক্রৌঞ্চ-বিরহীর বক্ষভেদী বেদনার করুণ বিলাপ
তামসী তমসা তীরে অশ্রুপ্লুত বাল্মীকির প্রাণান্ত বীণায়।
বিরহের মন্দাক্রান্তা এখানেও মন্দগতি পা ফেলিয়া যায়
(আমারো নিষ্ঠুর ফ্যানি প্রেমের প্রথম অর্ঘ্য পায়ে দলে গেছে)
জীবনের লঘুছন্দ আর্যা আর পয়ার ত্রিপদী
এখানে মিলেছে আসি পরিপূর্ণ ঐকতানে পথশ্রান্ত নদী।

মিল খোঁজ নাই বুঝি তবু আছে মহাশ্চর্য মিল !
মৃত্যুর মুখের কাছে প্রাণ ভরে শেষ দেখা
এ সংসার, এ ভুবন—আমার নিখিল।
শেষ দেখা; তাই এত পরিপূর্ণ ব্যাপ্ত করে দেখা,
হৃদয়ের রক্তধারে এ বশিষ্ঠ-জীবনের বহ্নিভাষ্য লেখা।
এ লেখা লিখেছে কীট্‌স্, সুকান্ত ও তরুঅরু, শ্রীমধুসূদন
আমিও লিখিয়া যাই কৃষ্ণচূড়া কবিতার রক্তাক্ত চরণ।

জীবন-তোরণ দ্বারে প্রাণপণে আমিও বাজাই
মৃত্যুসাথে মিলনের মধুর সানাই।
তবু যেন সে সানাই ব্যর্থতার সুরে সুরে বাজে
আমার যে রহিল না কিছু।
কীট্‌সের ছিল কাব্য, হতাশা আমার শুধু মৃত্যু পিছু পিছু—
সোনার কবিতা মোর হাত থেকে কলম নিয়েছে॥

একটি গাছ

পথের ধারে চারাগাছটা বাড়ে না
কেবলি খেয়ে যায় গোরুতে আর ছাগলে।
তার উপরে রয়েছে ছোট ছেলেদের উৎপাত—
বিনা কারণে লাঠির শপ্‌শপাৎ।
যদি বা একটু বড় হল—ধুলোর ভারে নত ;
রোগা ঝিরঝিরে ডালে ছ'পাঁচটা হলদে ম্লান পাতা।
বাস-লরীগুলো হু হু চলে যায়
আর ওর সারা দেহ কেঁপে ওঠে ভয়ে, শঙ্কায়।
সবুজের চিহ্ন হারিয়ে গেছে লাল সুরকির রক্তে
বয়সের কোনো হদিস্‌ নেই ওর
যেমন ছিল পাঁচ বছর আগে আজও ঠিক তেমনি।
পূর্ণ-সৌরভ নেই বুঝি ওর পঙ্গু দেহের কোথাও—
অকাল বার্ধক্যের জরাজীর্ণতা, মৃত্যুর পাণ্ডুর ছায়া।
অনবরত সবুজ কুঁড়ি মাথা তুলে জাগে
আর, আর ঝরে পড়ে ধূলোর অভিশাপে—নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে।

সংগ্রাম করে চলেছে তবু :
শিকড়ের সহস্রাঙ্গুলে আহরণ করে মৃত্তিকার সঞ্জীবনী।
হাওয়ায় নড়ে ওঠে ওর ধূলোম্লান অপূর্ণ পাতা—
পুষ্পমঞ্জরীর স্বপ্ন-শিহরণ ওর শিরায় শিরায়।
ও ভাবে, ও বাঁচবে—ওকে বাঁচতে হবে—এই ওর সাধনা,
পুষ্পপল্লবিত পরিপূর্ণ বনস্পতির স্বপ্ন উঁকি দেয় ওর তপস্যায়।...
দূর দিগন্তেও বুঝি দেখা যায় কালো মেঘের আনাগোনা।
অদৃশ্য ঈশানে বুঝি বেজে ওঠে মুক্তির ঘোষণা।—
কে জানে নব বর্ষণের প্রস্তুতি কি না! নতুন দিনের!!

হয়ত ধুয়ে মুছে যাবে সমস্ত সঞ্চিত মলিনতা,
হয়ত সত্যি বনস্পতির সম্ভাবনায় মুঞ্জরিত হয়ে উঠবে সারা দেহ—
নবজীবন পাবে ওর ক্ষুধিত অন্তরাত্মা!
পাবে কি? আর কত দিন?

তাম্রলিপি

"What if we still ride on, we two
With life for ever old yet new,
Changed not in kind but in degree,
The instant made eternity,—
And heaven just prove that I and she
Ride, ride to-gether, for ever ride ?"

প্রয়োজন-দৈত্যটার খামখেয়ালে তৈরী
ট্রাম বাসের এই টিকেটগুলো ;
প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলেই ঘটে ওর অপমৃত্যু।
নাম-না-জানা এই অসংখ্য টিকেটের ভিড়ে
দুটি টিকেট অমর হয়ে রইল আমার জীবনে
হারিয়ে যাওয়া আনন্দলোকের নিঃশব্দ পত্রলিপি।
বিস্মৃত প্রেম-লোকে সে আমার মান্দাক্রান্তা মেঘদূত,—
আমার যৌবন-গোধূলির হংস-বলাকা
উড়ে চলেছে স্মৃতির স্বর্ণমণ্ডিত আকাশে।...

ওর নাম ছিল ছায়া।
ট্রামের পথে খাতা থেকে চুরি করে দেখিনি এ নাম
শুনেছি সতীর্থ-সহপাঠিনীদের কণ্ঠে,
শুনেছি সন্ধ্যার অস্পষ্ট ছায়ালোকে
বহুবার বহু অধ্যাপকের মুখে।
ও ছিল আমার নৈশ-ক্লাশের সতীর্থা—রোল নম্বর তের।
নামের সঙ্গে থাকে মানুষের এত মিল
জানা ছিল না এর আগে :
যেন কোন সুদূর স্বপ্নলোকের মধুছন্দা মায়া
ধরা দিয়েছে এসে মাটির অঙ্গনে।

কালিদাসের 'তন্বী' কথাটি মনে পড়ে ওকে দেখলে।
একটু লম্বা ধরনের দোহারা গড়ন,
চন্দন-শুভ্র দেহটি আলো-জাগা ভোরের মতই উদার, সবুজ
স্নিগ্ধ নির্মল হাত দুটি সূর্য-ধারার মত নিটোল
উজ্জ্বল প্রাণময়তায় অমনি বুঝি উর্মিল।
কালো কোমল খোঁপাটি আলতো করে বাঁধা—
কালোর ফাঁকে ঝিকিয়ে ওঠে পেলব ঘাড়ের শুভ্রতা।
সুডৌল গৌর মুখখানিতে
মূর্ত হয়ে আছে একটি সীমাহীন স্বপ্নিল আলোকচ্ছন্দ—।
রেখাঙ্কিত চিবুকে, গলায় যৌবনের জয়ধ্বনি,
সুবিস্তৃত ভ্রমর-ভুরুতে দিগন্তের ব্যঞ্জনা।
চোখের পাতা দুটি যেন টেনে মেলতে হয়—
এমনি মেঘ-মেঘ সে চোখ দুটি।
ভারী পল্লবে স্নেহ-সবুজ দৃষ্টিটি স্বপ্নের মত নরম—।
অজন্তার ধ্যানী বুদ্ধের সাথে যোগ রয়েছে কোথায়!
রক্তাভ ঠোঁট দুটি একটু চাপা,
ঈষৎ উন্মীলিত ঠোঁটের ফাঁকে সূর্য সুরের মূর্চ্ছনা।

দুই কানে দুই স্বর্ণকুণ্ডল, হাতে একগাছি করে চুড়ি,
সাধারণ একখানা আটপৌরে শাড়ী ওর পরনে।
ওকে দেখলে মনে পড়ত তপস্যা-নিরতা উমাকে,—
—কালো-নিবিড় চোখে ওপারের তন্ময়তা।
ওর নিরাভরণ তনু দেহটি প্রভাতী সূর্যের ধরিত্রী-বন্দনা।
লাল-পেড়ে শাড়ীখানি পরে ও এসে বসত নির্দিষ্ট আসনে
সময় হলে চলে যেত সম্রাজ্ঞীর মত।
সতেজ ভঙ্গিতে ওর সহজ পদক্ষেপে কোথায় বেজে উঠত
ঐতিহাসিক এলিজাবেথের পদধ্বনি;

অথচ, নিত্য কালের বাঙালী ঘরের মেয়ে :
মধ্যবিত্তের বিত্তহীন ঘরে কেটেছে ওর অস্পষ্ট শৈশব,
রূপোলী কৈশোরও চলে গেছে বেসুরো কিঙ্কিণী বাজিয়ে,—
আজ সোনালী যৌবনও এগিয়ে চলেছে কর্তব্যের শুভ্র শৈলে
নৈষ্টিক কৃচ্ছ্র তায় চড়াই-উতরাই পার হয়ে।
স্কুলের খাটুনির পর বাণী মন্দিরে এই নৈশ পরিক্রমা॥

বলতে নেই আজ আর লজ্জা।
ভালোবেসে ফেলেছিলাম ওকে প্রথম থেকেই।
মনে হয়েছিল ওকে দেখে,—এই আমার পরম আশ্রয়
আমার জীবন বীণার সুর সরগম্,
আমার আত্মা আরতির পঞ্চ-প্রদীপ।
ওর সংযত-বাক্ প্রশান্ত-মধুর সংহত ধ্যানমূর্তি
আমায় আকর্ষণ করল তীব্রভাবে॥
অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছি ওর চোখের দিকে
প্রোফেসরের পড়ার ফাঁকে ;—ও বাধা দেয়নি।...
সঙ্গিনীদের হাসির ঝলকে মিষ্টি মধুর হাসিটি ওর
গ্রহণ করতাম সকল দেহ মন নিয়ে।
সারাদিন অফিসের একঘেয়ে খাটুনির পরে
শ্রান্ত দেহে ভগ্ন মনে ফিরে আসতাম কলেজে,
ঘুমিয়ে পড়ত আমার আহত চিত্তটি ওর একান্ত সান্নিধ্যে
মানসলোকের মণিকোঠায় ;
মাতৃস্তন্য পান-তৃপ্ত অসহায় শিশুর মতই।
সর্বাঙ্গে অনুভব করতাম ওর স্নেহ-কোমল পরশ॥...

ও বসত আমার মুখোমুখি ওদিকের বেঞ্চিতে।
সি. কে. বি'র নোটস্ নিতে-পরিচয় হয়ে গেল একদিন হঠাৎ
চোখে চোখে নীরব ভাষার লেনদেন :

মাথা নীচু করল ও মৃদু হেসে,—
মন বলল, "পেয়েছি—পেয়েছি—আমি পেয়েছি"।...
ওর সারা চোখে স্বীকৃতির মূর্ছনা,—
আমার রক্তের স্পন্দনে বেজে ওঠে আরতির শঙ্খ ঘণ্টা।
এমনি করেই এগিয়ে চলে দিন....॥

জীবনের উত্তাপে বাণীর ফুলঝুরি রচনা করা
—সেই ছিল আমার চিরকালের নেশা।
মেয়েদের ভালো-লাগাকে আমোল দেইনি কোনো দিন।
দায়িত্বহীন ছন্নছাড়া—মনের বোহেমিয়ান মানুষটি
ঘর বাঁধার স্বপ্নকে দূরে সরিয়ে রেখেছে চিরকাল।
জীবনে চলার পথে দেখা হয়েছে অনেক মেয়ের সঙ্গে—
ভালো লেগেছিল তাদের অনেককে বিশেষ এক মুহূর্তে—
কিন্তু মুহূর্তের ভালো-লাগাকে বাস্তবের সহকারে জড়িয়ে দিয়ে
স্থায়ীতর করার প্রচেষ্টা ছিল না কোথাও।
জীবনের তাকিয়ায় ঠেসান্ দিয়ে গুড়গুড়ি টানা—
সে আমার সইবে না।
ওদের ক্ষণিকের ভালোবাসাকে তাই উড়িয়ে দিয়েছি
হাল্কা হাসির ছন্দে,—কাব্যের অমরাবতীতে।
ব্যক্তিটিকে বাদ দিয়ে নারীর মাধুর্যের উত্তাপটুকু
উপভোগ করার ক্ষমতাটি আমার জন্মগত ;—
পথে পথে নানা সম্পর্কের মধ্যে তার বিচিত্রতর প্রকাশ।
মেয়েদের মধুর সান্নিধ্যে কলম হত আমার গতিময়
আর সেই ছিল আমার পরম প্রাপ্তি॥
আজো ভাবলাম ওর কোমল উষ্ণতায় কলম হবে মুখর।
হায়রে! আমার সেই চিরকালের কলম
আজ যেন আর চলতে চায় না এক পা,—নিস্পন্দ।

সহজ হয়ে কথা কইতে পারি না ওর সঙ্গে কিছুতেই

এতদিনের পরিচয়েও ;—ভাবি এমন কেন হয় !

চিরদিনের ওভার-স্মার্ট আমাকে এক মুহূর্তে কে বানিয়ে গেল

একটি তের বছরের লাজুক ছেলে :

অন্তরের মধ্যে গুমরে মরছে কত অস্পষ্ট কলগুঞ্জন।

চেষ্টা করলাম কবিতার ঝরণাধারায় মুক্তি দিতে

আমার উদ্বেলিত মনের নিরুদ্ধ বেদনাকে।

কিন্তু, হল না তা কিছুতেই।

ওর তনুদেহের ছন্দে বাসা বেঁধেছে আমার কবিতার মিল,

তাই মুখর কবি বসল গিয়ে নীরব কবির আসনে।

আর্ট-গ্যালারির মডেলটি কখন বসেছে গিয়ে

আমার জীবনের মাটিতে আসন পেতে !

তবু সেদিনের আমার কাছে সত্য ছিল কবি-খ্যাতি,

মানুষ হয়ে ধরা দিতে রুখে দাঁড়িয়েছে কবি-অহমিকা,

জীবনের মূল্য অস্বীকার করেছি অনায়াসে ॥

লম্বা-হাতা ব্লাউজ পরে ও সেদিন এসেছিল ক্লাশে

কনুইর কাছ পর্যন্ত নেমেছে হাতার বহর

সামান্য কি কাজ করা।

গলা-বন্ধ ব্লাউজটা ঢেকে রেখেছে বুকের সবটাই

কৃপণের ঐশ্বর্যের মত।......

সব মিলিয়ে তবু মনে হল সেদিন অপূর্ব !

তৃষিত চাতকের কাছে যেন আষাঢ়ের অমিয় সিঞ্চন

ধূসর মরুভূ প্রান্তরে যেন নীলাম্বরি মেঘ।......

তির্যকভাবে আলো এসে পড়েছে ওর চোখে, মুখে, গালে—

মনে হল পৃথিবীর বুকে পরিপূর্ণ একগুচ্ছ চৈতালী ফসল।

লেকচার শুনতে আনমনা হয়ে যাই কেবলই

ঘুরে ঘুরে মনের মধ্যে ভেসে ওঠে ওর সুন্দর মুখখানি :—

ওর কপোলের আপেল-মসৃণ পেলবতা,
স্পর্শিল চিবুকের ঈষৎ রেখাঙ্কিত বক্রতা—
'ভ্রু-ভিঞ্চির পেন্সিল স্কেচিং-এর রেখার মত
নীল শাড়ীর ছায়ায় ওর উন্নত বক্ষের কোমল উষ্ণতা,
ওর হাসির অব্যক্ত রুমুঝুমু,—আমায় করে তোলে বিহ্বল।
শাড়ীর পাড়ের আবরণে ওর স্পর্শ পেলব পা দুটি
মাটির বুকে যেন শুভ্র আল্পনা।
পরীক্ষার তখন নেই বেশী আর বাকী—
এসেছিলাম আমরা পি. কে. এস'এর টিউটোরিয়াল ক্লাসে।
নোটস্ নিতে কলম হয়ে আসে মন্থর···
এক সময়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে এলাম ক্লাস থেকে।
বাসায় ফিরেও পড়াশোনা হল না সেদিন কিছুই,
বসলাম কবিতা লিখতে।
আমার অবরুদ্ধ বেদনার অন্তর্দাহ
প্রকাশের দুয়ারে মাথা কুটে মরছে কেবলই······॥

হপ্তা না যেতেই প্রকাশ করলাম একটি দীর্ঘ কবিতা
বন্ধুর কাগজ 'চলমান'-এর প্রথম পাতায়।
পত্রিকাটি সঙ্গে নিয়ে ক্লাশে গেলাম একটু দেরি করেই
ক্লাশ শেষ হতেই গিয়ে দাঁড়ালাম তিন নম্বর বাস স্ট্যাণ্ডে;
এ পথেই ও বাড়ী ফেরে রাত ন'টায়।
এ বাস—এ পথ জানা আমার অনেক দিনের,
ওর সঙ্গে একান্তে কথা বলার প্রলোভনে
এখানে এসে দাঁড়িয়েছি অনেক ক্লাসের শেষে।
দেখা হয়ে যেত কোনো কোনো দিন ওর সঙ্গে;
মনে হত, ও নিজেও বুঝি বলতে চায় কোনো না-বলা কথা।···
দু-তিনটে বাস চলে যাওয়ার পর উঠে পড়ত এক সময়।

তিন নম্বর বাস হুহু করে চলে যেত আমার চোখের সামনে।...
ইচ্ছে হত ওর সঙ্গেই চলে যাই এস্‌প্ল্যানেড, কি আরো দূরে
দেখে আসি কোথায় ওর ঘর......!
সম্ভব হয়নি তা কোনোদিন; আঘাত লাগত আত্মমর্যাদায়।
মনের কবিটিও বেরিয়ে এসে চোখ রাঙিয়ে বলত, "ছিঃ:
মুক্তপক্ষ, বন্ধনহীন তুমি যে কবি!"
নীরবে এসে তাই নীরবেই গেছি ফিরে,
কাব্যের অমরাবতী ছেড়ে জীবনের মাটিতে পা বাড়াতে সঙ্কোচ!

কিন্তু নাঃ—আজ আর দেরি নয়
কাগজটা ওকে দিতেই হবে, যেমন করে হোক।
পত্রিকার উপর লিখে এনেছি ওর নামটি সযত্নে:
নাম যে এত মধুর হয়—পড়েছি বৈষ্ণব কবিতায়,
জীবনে অনুভব করলাম সেই প্রথম।
ছায়া ছায়া ছায়া:
নামমন্ত্র মধুর হয়ে উঠত আমার কণ্ঠের অজপায়;—
একটা অজানা পুলক-সৌরভে ভরে উঠত আমার দেহ-মন।
মনে আছে সমস্ত পৃষ্ঠা ভরে ফেলতাম ঐ নাম লিখে অকারণে
—নিতান্ত ছেলেমানুষের মত; ভালো লাগত।
'ছায়া' লেখা বিল্‌টি সযত্নে তুলে রাখতাম পকেটে
'ছায়া' রেস্তোঁরাতে বার বার খেয়ে।......

কখন এসে ও বাস্‌ স্ট্যাণ্ডে দাঁড়াল ধীরে ধীরে।
দেখুক্‌ গে! আজ আর পালাব না কিছুতেই
খসে যাক্‌ আমার আত্মসম্মানের মিথ্যা নির্মোক।...
... ... ওর সঙ্গে আমিও উঠে পড়লাম তিন নম্বর বাসে,
বুকও আমার কাঁপতে সুরু করল দুরু দুরু।

বাসে ঠাঁই নেই কোথাও একটুকু
ডাবল্-সিটেড্ সংরক্ষিত আসনে ও বসেছিল একা— ।
কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই মৃদু হেসে জায়গা দিল একপাশে,
বলল, "বসুন না" !
সঙ্কোচ কাটিয়ে কাগজটা তুলে দিলাম ওর হাতে
বললাম, "আপনার জন্যে এনেছি ।"
কাগজটা হাতে নিয়ে বলল, "আপনাদের সেই কাগজটা বুঝি !
আপনার লেখা আছে নিশ্চয়ই" ।
"হ্যাঁ···" বলতে যাচ্ছিলাম অনেক কথাই ; হল না ।
আমাদের পিছনের আসনেই বসে আছেন এক সতীর্থা
মুখে তার দেখলাম প্রচ্ছন্ন হাসিটি ।....
রীতিমত ঘাবড়ে গিয়ে উঠে দাঁড়াতে গেলাম তক্ষুনি...
ও বলল, "নামবেন নাকি এখানে... ?"
আমি বললাম জড়িত কণ্ঠে—"না" ।
চোখের দিকে চেয়ে ওঠা আর হল না,—বসে রইলাম পাশেই ॥

চুপ চাপ বসে আছি ; ভাবছি কেমন ক'রে কথা করি স্বরু !
সতীর্থার কানটি রয়েছে আমাদের দিকেই পাতা ।....
বাস এগিয়ে চলেছে নৃত্যভঙ্গিতে এঁকে বেঁকে—
ওর শাড়ীর অঞ্চল এসে স্পর্শ করছে আমার দেহ
সঙ্গে আমার মনও ।
ওর নরম মুখে অস্পষ্ট আলো ছায়ার স্বপ্ন রচনা—
কানের কুণ্ডলটি দুলছে ; ঝিকমিক্ করছে আলোয়—
মৃদু হাওয়ায় কেঁপে উঠছে কয়েকটি অলকচূর্ণ ।
কোলের উপর আলতো ভাবে পড়ে আছে একখানি হাত
এক গুচ্ছ শুভ্র ফুলের মত— ।

ও চেয়ে আছে বাইরের দিকে, কী ভাবছে কে জানে !
স্বপ্নবিহারী মন আমার উড়ে-চলে কাব্যের জগতে—
আমার সমস্ত সত্তা ডুবে যায়
একটা সীমাহীন অখণ্ড স্বপ্নময়তায়।
মনে পড়ল ব্রাউনিং-এর 'লাষ্ট রাইড্ টুগেদার' :
মনে হল এ বাস যেন আর থামবে না—
এ রাত্রির হবে না অবসান।
কোলকাতার ধোঁয়াটে আকাশে চন্দ্রালির অস্পষ্টতা—
এ আকাশ যেন এমনি নীরব হয়ে থাকে চিরকাল !
আমাদের এ মিলিত যাত্রা নোঙর ফেলে না কোথাও !!
ট্রাম বাস-ঘর্ঘর কোলকাতা পড়ে রইল কোথায়
কোন মিথ্যার গাঢ় অন্ধকারে—
সত্য হয়ে উঠল শুধু আমাদের যুগ্ম-যাত্রাটি—আমি আর সে।

হঠাৎ চমক ভাঙে কণ্ডাক্টরের রূঢ় প্রশ্নে,—"টিকেট" ?
তাইত, টিকেট !
পকেট হাতড়ে দেখি পয়সা নেই একটিও,
আনতে ভুলে গেছি বেমালুম—খেয়াল হয়নি।
মনে পড়ল শেলীর কথা :
মেরি গড্উইনকে নিয়ে যখন পালিয়ে যাচ্ছিলেন ইতালীতে
পয়সার কথা মনেই হয়নি তাঁর কবি মনে
ফুরিয়ে গিয়েছিল মাঝপথে। আমি যেন যুগান্তরের শেলী
পালিয়ে যাচ্ছি আমার মেরিকে নিয়ে সীমাহীন অজানার পথে—
সমাজ-সংসার লজ্জা-ভয় থেকে অনেক অ-নে-ক দূরে।
আজ আমার, এই নতুন আমার কোনো লজ্জা নেই,
বললাম, "পয়সা নেই, টিকেট করুন আমার জন্যেও একটা"।

বুঝতে পেরেছিল বোধ হয় আমার বিব্রত অবস্থাটি
কণ্ডাক্টারের হাতে পয়সা দিয়ে জিজ্ঞেস করল'
"যাবেন কোথায় আপনি" ?
সত্যিই তো, যাব কোথায় ? এ তো আমার পথ নয় !
একবার ইচ্ছে হল বলি, "তোমার সঙ্গেই, যেখানে যাবে তুমি"।
নাঃ—বলা হল না তা কিছুতেই
ভদ্র মুখ থেকে বেরিয়ে এল, "এসপ্লানেড" ॥

ওয়েলিংটনে গাড়ী আসতেই উঠে দাঁড়াল ও নামবে বলে,
"এখানেই নামবেন আপনি" ? জিজ্ঞেস করলাম আমি।
"হ্যাঁ"—সহজ সংক্ষেপ উত্তর দিয়ে পা বাড়াল দোরের দিকে।
"টিকেটটা আপনার"—বাড়িয়ে দিল হাতখানি।
সাগ্রহে তুলে নিলাম দুখানা টিকেটই ওর হাত থেকে।
ও নেমে গেল বাস ছেড়ে ॥···

একটা খুশী-ভরা মন নিয়ে ফিরে এলাম বাসায়
পুলকের উত্তাপটুকু বুকে নিয়ে কেটে গেল সারাটি রাত,—ঘুম নেই।
খুশীর ঝরণাধারায় স্নান করে উঠেছে আমার চিত্ত—
'পেয়েছি'র আনন্দে পরিপূর্ণ আমার মন।
দিনরাতগুলো যে লাফিয়ে লাফিয়ে কেমন করে চলে গেল
খেয়ালই রইল না আমার।
আবেগ-উদ্বেল অন্তরে কেটে যায় দিনের পর দিন—
কাব্যের দরিয়ায় ভাসিয়ে দিচ্ছি অনুভূতির নৌকোগুলো ঃ
কবিতা কবিতা, আর কবিতা···।
কোত্থেকে একটা সঙ্কোচ এসে দাঁড়াত পথ রোধ করে.
ক্লাসে যাওয়ার কথা মনে হলেই।

একটি রাত্রির ব্যবধানে কাব্যের খোলসটি কখন গেছে খসে
জীবনের জোয়ার এসে আঘাত হেনেছে আমার কূলে কূলে।
কবিখ্যাতির মোহ রইল তোলা।
মানুষ আমি—এই সত্যটাই বড় হয়ে দেখা দিল হঠাৎ ॥

সেদিন হপ্তাখানেক পর গেলাম কলেজে :
এ যেন পূর্বরাগের সমাপ্তির পর মিলনের অভিসার
চোখে ও আমার অভিসারের কাজলরেখা।
ক্লাসে ঢুকতেই বলল এসে বাণীদি,
"এই যে কবি ভালো তো ! কী ব্যাপার !! দেখা নাই যে অনেকদিন,
কাব্য-সাধনা না পরীক্ষার তপস্যা ?"
হেসে জবাব দিলাম, "ওর একটাও নয় বাণীদি,
আজকের সাধনা সম্পূর্ণ নতুন পথে।"
হেসে বলল, "তারপর ! সংবাদ শুনেছেন এদিককার ?
কবির প্রয়োজন হয়েছে আমাদের হঠাৎ,
ভাবছিলাম হানা দেব আপনার বাসায় ;—খুব জরুরী।
জানেন তো জয়ার আসছে রোববার বিয়ে,
উপহার রচনার দায়িত্ব কিন্তু আপনার···"।
একটানা বলে গেল বাণীদি—
ভ্যানিটি থেকে বের করে দিল গোলাপী রঙের কার্ডখানা।
অচেতন হাতটা বাড়িয়ে দিলাম।
সমস্ত চিঠিখানা মিলিয়ে গেল সীমাহীন অস্পষ্টতায়,
পড়তে পারলাম না একটা অক্ষরও ;—সব ঝাপসা।
বন্ধুবান্ধবীর দল সবাই এসে জানিয়ে গেল সুসংবাদ,
ক্লাসের সর্বসম্মতিক্রমে কবি-সার্বভৌম
আমার উপরই চিঠি লেখার ভার।
সাগ্রহে গুণছে তারা বিবাহোৎসবের শুভদিন ॥

রৌদ্রদীপ্ত আকাশে আমার কাল বোশেখীর গুরু গুরু
রক্ত-ঝর-ঝর মনে আমার ঝড়ের মাতন।

বাথরুমে গিয়ে চোখে জল দিলাম বার বার
চোখের আষাঢ় গড়িয়ে পড়ে তবু।
মনে পড়ল সেই রাত্রির কথা :
কেন ওকে দিতে গেলাম সেই কাগজ ? স্বেচ্ছায় এ অপমান,
কী মনে করেছে আমার কবিতা পড়ে ?

তার অক্ষরে অক্ষরে যে গড়িয়ে পড়েছে আমার কান্না।
নাঃ, ক্লাস করা আর হবে না—দেখা করব কী করে ?
ও আসেনি এখনও ক্লাসে, পালিয়ে এলাম বাসায়।

বোধন-উৎসবে বেজে উঠল বিজয়া-দশমীর বাজনা।
বালিশে মুখ গুঁজে কান্নার অর্ঘ্য সাজিয়ে দিলাম ওর উদ্দেশে।
কোনো মেয়ের জন্য কাঁদব—ভাবিনি তা কোনো দিন,
কবির মনে জীবনের হাহাকার !
সহজে যাকে পাওয়া যেত হারালাম তাকে অবহেলায়,
ওরে ভীরু ! ওরে দুর্বল !! কাব্য নিয়ে জীবন চলে না,
অশ্রুমূল্যে সময় এসেছে তা বুঝ্‌বার।

কাব্যের মিনারে বসে জীবনকে করেছিস কেবলই অপমান
তারই প্রায়শ্চিত্ত আজ বেদনার মরুভূতে।
ওর সঙ্গে পরিচয়ের প্রথম দিন থেকে
সব কথাই মনের মধ্যে ভেসে ওঠে একে একে।
দোষ নেই ওর এতটুকু,

জীবনের মধুকুঞ্জে ওর আমন্ত্রণ তো পেয়েছিলাম বহুবার,
ওর দুই চোখে ঝরে পড়েছে প্রাণ-প্রার্থনা।

কল্পলোকের কবিতা-ব্যবসায়ী আমি
আমার সত্যকার স্বরূপ জানতে দেরি হয় নি ওর।

জীবনের স্বপ্নলোকে তাই এড়িয়ে গেছে আমাকে একপাশে।
বোবা আমি, অন্ধ আমি, কাব্যের কঠিন গ্রানাইটে বন্ধ
ডেকে ডেকে ফিরে গেছে ব্যর্থ প্রতীক্ষায়॥…

সদ্য-লেখা কবিতার খাতাটা পুড়িয়ে ফেললাম তখনই :
কত রাত্রির সযত্ন প্রয়াস পুড়ে গেল ছাই হয়ে ;
বিদায় নিলাম কাব্যলক্ষ্মীর দুয়ার থেকে চিরদিনের মত।
এর পর আর একটি মাত্র কবিতা লিখেছি—সে সেই উপহার :
বান্ধবীদের সঙ্গে ছায়া নিজে এসেছিল আমার বাসায়
রচনা করে দিয়েছিলাম 'শেষের কবিতা'—
অপরিবর্তন অর্ঘ্য রেখে আমি চলে গেছি পরিবর্তনের স্রোতে ;
তবে স্বেচ্ছায় নয়—কেঁদে।
আমি যে কবি সে স্মৃতি স্পষ্ট তখনও আমার মনে—
বাঁশীতে বাজিয়ে গেলাম তাই নিজের চরম ট্র্যাজেডি
সুনিপুণ শিল্পীর মত সুসংযমে—সেই শেষ॥

তারপর আজ চলে গেছে কতদিন, কত মাস, কত বছর।
সেদিনের বন্ধু-সতীর্থেরা কে কোথায় কে জানে!
ছায়ারও সংবাদ রাখি না আর—
শুধু মনে পড়ে সেই অনুপম মেঘ-মেদুর চোখ দুটি!
হয়ত কোনো আনন্দময় সংসারের আজ সে গৃহিণী
কারো বঁধু—কারো মা—প্রিয়া বা কারো।
অবশিষ্ট নেই সেদিনের কোনো স্মৃতিই আজ
এই চল্লিশোর্দ্ধ জীবনের ছায়া-ধূসর লগ্নে।
বিস্মরণের বালুতীরে হারিয়ে ফেলেছি সব—।
ওর একটা ছবি ছিল আমার কাছে,—কেমন-করে-পাওয়া—
ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি তাও সেই ভীষণ রাতে।

সেদিনের আমার ছায়াময় জীবনের কোনো মায়াই নেই।

শুধু আছে সেই লাল রঙের টিকেট দুটি

তিন নম্বর বাসের সেই আনন্দময় রাত্রির সুখ-স্বপ্ন নিয়ে

উজ্জ্বল হয়ে আমার জীবনে :

সেই 'লাষ্ট রাইড টুগেদার'-এর তন্ময়তা নিয়ে

আজো যেন চলেছি আমরা দুজন পাশাপাশি—সে আর আমি।

আমার পেরিয়ে-আসা দুর লোকের অক্ষরহীন ছাড়পত্র

কালের কালো যবনিকা থেকে আজো এনে দেয় ওর সংবাদ

বিরহ-বিধুর কোনো সন্ধ্যায়, শ্রাবণ রাত্রির নিঃসঙ্গতায়

কেমন-লাগা এক নরম বিকেলে, একান্ত নির্জন দুপুরে

আমার স্পর্শ-রঙিন তিন নম্বর বাসের অখ্যাত টিকেট দুখানি।

এই মুহূর্তের জগতে সীমাহীনের নির্জন তাম্রলিপি ॥

কবর

বোকা চাঁদটা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে……।

তার নীল ঠোঁটের উষ্ণতা যে মিলিয়ে গেছে কবে!

কালো চোখের আলোও তো আর নেই—এযে তার কবর!…

বাসর-শয্যায় সেদিন শুয়েছিলাম দুজনে পাশাপাশি

পূবের জানালাটা খুলে……

সে তো আজ এক বছর হয়ে গেল……।

বোকা চাঁদটা ভাবছে আজো বুঝি সেই রাত!……

দুটি ফুল

"বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি"—

একটি প্রতিজ্ঞা ছিল দুটি হাতে খরো খরো উদ্যত ধারালো
দুটি বুকে একটি গান মৃত্যুঞ্জয়ী সুরে,
ধ্যান-নীল চোখে স্বপ্ন অনাগত উজ্জ্বল দিনের :
দুর্বার প্রতিজ্ঞা সে তো বিশ্বব্যাপী আসন্ন মুক্তির
সে গান মৈত্রীর আর সেই স্বপ্ন মহান শান্তির,—
তারই জন্য প্রাণ দিলে হে প্রবুদ্ধ, হে প্রেমিক শান্তি-তীর্থঙ্কর
হে মহান আলোর দম্পতি ! তোমাদের আনত প্রণাম।

দেখেছি হাসির মত শুভ্র স্বচ্ছ ঝকঝকে তাজা দুটি ফুল
পাথরের বুক চিড়ে একই বৃন্তে ফুটে উঠেছিল,—
অতলান্ত সাগরের লোনা জলে আশ্চর্য যে ফুল ফুটেছিল
টরন্যাডোর সর্বধ্বংসী ঘূর্ণির মধ্যেও।
সে ফুলের কোষগর্ভে এত-এত-এত ছিল সৃষ্টির বারুদ
ভাবিনি তা ; ভাবিনি তা সারা বিশ্ব ঝুঁটি ধরে এমন কাঁপাবে,—
ওরাও ভাবেনি :
রাত্রির তিমির ভেদি পথে পথে জ্বলিবে এ অজস্র মশাল।
বিদ্যুৎ-পাহাড়ে তবে বিদ্যুৎ-দীপ ছোঁয়াতে যেত না।
ভরেছে পৃথিবী আজ অগ্নিগর্ভ পাহাড়ের লেহি লেহি স্ফুলিঙ্গ উদ্গারে—
লাল টকটকে এই সিঙ্ সিঙ্-বিস্ফুরিত প্রজ্জ্বলন্ত রক্তের আগুন :
বিদ্রোহী সে বহ্নিস্রোত রোম-প্যারি-লণ্ডনের পথে—
উৎক্ষিপ্ত উত্তাল লাভা ক্ষুব্ধ হাতে হেনেছে আঘাত
গ্রানাইট্ পাথরে বুঝি ফাটল ধরাল !
শান্ত সমুদ্রের বুকে এল আজ অকস্মাৎ আগুনের উদ্দাম জোয়ার,—
শাশ্বত সত্যের নীলে বহ্নিকরা দুটি চাঁদ জুলিয়াস্, এথেল্ দাম্পিকা—

তোমাদের দিকে চেয়ে জেগেছে এ সুপ্ত বুকে অশান্ত তুফান
আমরা জেগেছি আজ মৃত্যু-শয্যা থেকে।

দৈত্যের উন্মাদ দম্ভ পৃথিবীর সর্বনাশ—মহা পাশুপত
উদ্ধার করেছ তুমি তাহার গোপন তথ্য দানবের গুপ্ত-গুহা থেকে
বুধশ্রেষ্ঠ তুমি জুলিয়াস্!
দুহাতে বিলায়ে দিলে এই মন্ত্র নন্দনের প্রতি নর-দেবতার কাছে,
যারা লুপ্ত স্বর্গরাজ্য দানবের হাত থেকে উদ্ধারের সঙ্কল্প নিয়েছে—
নিয়েছে মুক্তির ভার সেই সব বন্দী মানুষের—
হিংস্র দৈত্য-পদতলে অসহায় মৃত্যুভয়ে কাঁপিতেছে যারা।
হে সাত্ত্বিক তপস্বী যুগ্ম! হে প্রজ্ঞাত্মা আলোর দম্পতি!
শক্তি দাও, আলো দাও, তেজ দাও তোমাদের মহা-উৎস হতে।
অকুণ্ঠ নির্ভীক হয়ে দাঁড়াতে শেখাও বন্ধু উঁচু বুকে তোমাদের মত
আসুক বাঁধুক বাসা ভীরু বক্ষে তোমাদের সুদৃঢ় প্রত্যয়।
মুক্তির প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিতে
এ হাত কাঁপে না যেন; নাম দিতে বিশ্বব্যাপী শান্তি-সেনাদলে।
দুর্জয় সমৃদ্ধ কর আমাদের প্রাণের প্রচণ্ড পাশুপতে।

উল্লাসে করেছে খুন সত্যের সাধককে ওরা হেম্লকে, ক্রুশে,
গিলোটিনে,
তাঁদের হৃৎপিণ্ড-রক্তে বার বার রঞ্জিত এ মাটি।
ওদের আমরা যেন ক্ষমা আর করি না কিছুতে।
মুক্তিকামী জনতার বুকে বুকে হে অমর! তোমাদের অভ্যুত্থান হোক
দিকে দিকে জন্ম নিক মৃত্যুঞ্জয়ী সহস্র ফিনিক্স।
তোমার কবর থেকে অমিত প্রাণের সেনা মুক্তি-মন্ত্রে জাগুক জাগুক
তোমার স্বপ্নেরা বন্ধু মুক্ত পাখা বিস্তার করুক॥
দিগ্‌দিগ্‌-রক্ত-বহ্নি যেন আর নেভে না কখনও
ওদের সোনার লঙ্কা এ আগুনে পুড়ে যাক নিঃশেষিত হয়ে

মুক্তি-যজ্ঞ-বেদী-তীর্থে এ আগুন মুক্ত হাতে নিতে পারি যেন :

আমরা করিব হোম যুগ্ম-নামে সেদিন সে জলন্ত বহ্নিতে—

সেই হোম-বহ্নি-ধূমে কৃষ্ণ মেঘ আসিবে আকাশে

সর্বশান্তি সুরু হবে আষাঢ়ের অমৃত বর্ষণ ;

মাটি হবে শস্যশালী মুঞ্জরিবে মুকুলিবে প্রাণ।

মোদের তপস্যা দাও বহ্নি-স্বাহা! সাগ্নিক হবার।

আবার ফুটিবে ফুল যজ্ঞশেষ শুভ্র ভস্ম থেকে :

দুটি নয়, দশটি নয়, শত শত হাজার অযুত!

প্রস্ফুট প্রকাশে তার উদ্ভাসিবে তোমাদের মুখ—দীপ্ত দুটি ফুল!

তারাই স্বীকৃতি দেবে তোমাদের অগ্নি-তপস্যাকে

—অনাগত সেই সব নবজাতকের বুকে আনন্দিত মুক্ত পৃথিবীর

মর্ত্যের হে যুগ্ম পারিজাত!

সেই ফুল ফোটাবার স্বপ্ন আনো আমাদের বুকে—

এ শুষ্ক পাথরে এই ধূসর মরুতে ফুল ফোটাবার প্রাণান্ত সাধনা।

তোমরা ঘুমাও আজ জ্যোতি-শিশু! হে মুক্তি-দিশারী

তপ শ্রান্ত হে ঋষি-দম্পতি!

ঘুমাও, ঘুমাও!!

তোমাদের তাজা খুনে আমাদের বুকে আরো আগুন জ্বালুক

বিদ্রোহের বিক্ষুব্ধ আগুন।

দেখাক আলোর পথ সে আগুন রাত্রি অন্ধকারে—

মুক্তির, মৈত্রীর আর মহান শান্তির॥

হে বাল্মীকি !

বল্মীক-বৃত্তের পিছে—এ নির্মম, ক্লান্ত তন্দ্র কে তুমি বাল্মীকি
পর্বে পর্বে চলে গেছ লিখি
জন্মপূর্ব রামায়ণ এ মানব-সভ্যতার উষালগ্ন থেকে।
তুমিই তো একদিন এনেছিলে ডেকে
সূর্যবংশী রাজপুত্রে যুক্তহাতে কুমারী এ মৃত্তিকার কোলে।
পাণ্ডুর কাঁচলি বাস, প্রস্তর মেখলা গ্রন্থি মুগ্ধ সূর্য মুক্ত হাতে খোলে ;
উন্মুক্ত অক্ষত মাটি অনুরাগে রোমাঞ্চিয়া ওঠে।
তোমার কুশলী হাতে সবুজ কবিতা হয়ে ফোটে
মন্ত্রিত মুখর ঐ শুচি শুভ্র লাঙ্গল ফলকে
ঝলকে ঝলকে।
তুমিই তো পুরোহিত সূর্য আর পৃথিবীর প্রেমে :
'নব দূর্বাদল শ্যাম' একদিন এসেছিল নেমে
তোমার চৈতন্য থেকে নিয়ে আশীর্বাদ।
আজ কেন আদি কবি শীর্ণ পঙ্গু ন্যাজ সেই আদিগন্ত হাত ?
বন্ধন-বল্মীকস্তূপ হতে
আর কি হবে না মুক্তি আসিবে না এ তমসা পৃথিবীর পথে,
বিলাবে না রামায়ণ মুক্ত হাতে রসের ভাণ্ডার ?
মুমূর্ষু মানুষ আর পাবে না কি ন্যায্য অধিকার :
নবদূর্বা শ্যামশীর্ষে উদ্ভাসিত সোনার মঞ্জরি
মানুষের রিক্তাঞ্জলি উঠিবে না সোনাধানে— লাল গমে ভরি ?

রামের পৃথিবী-জন্ম সবচেয়ে সত্য প্রয়োজন,
কালজ্ঞ কবির কণ্ঠে তারি পূর্ব আবাহন, সপ্তকাণ্ড পূত রামায়ণ।
গৌতম তপস্যা পথে
বঞ্চনার বাজবক্ষে অক্ষমতী অহল্যা পাষাণে,
রাবণের হিংস্র থাবা রামায়ণ-ধানে।

যজ্ঞবেদী কেঁপে ওঠে তাড়কার তড়িৎ হানায়,
রামায়ণ নিলুণ্ঠিত, ছিন্ন, দগ্ধ লোভ-লুব্ধ দস্তের ছুপায়।
রামের নতুন জন্ম গুমরিছে অসহ্য ব্যথায়
মৌন যন্ত্রণায়।
হে আত্মবিস্মৃত কবি! এ ঘুম ভাঙিবে কবে আর
শ্যামল রামের জন্মে বহু শত্রু, বাধার পাহাড়।
কাব্যিক রামের জন্ম দিয়ে গেলে শুধু
রামরাজ্যে রাম নেই—শূন্য মাঠ করিতেছে ধুধু।
রামেরে জাগাও মর্ত্যে মুক্ত হবে মৃত্তিকার মূর্ত রামায়ণ:
তেত্রিশ কোটির প্রাণ ক্ষুধা সুধা গুহাগুপ্ত সঞ্জীবনী ধন।
অযোধ্যার এ মাটিতে সত্যিকার সর্বশান্তি রামজন্ম হোক!
খুলে ফেল ভীরুতার বিশীর্ণ নির্মোক
হে ধ্যানস্থ নির্বাক বাল্মীকি!
দস্যু রত্নাকর ছিলে একদিন, আজ তুমি ভুলে গেলে সেকি?

একলব্য

(কর্ণধার নিশাচর ছাত্রদের উদ্দেশে)

জীবনের রাজপথে ছাড়পত্রহীন মোরা, নাই কোনো গোত্রের প্রমাণ
ব্যাভিচারী বিধাতার ব্যাধিগ্রস্ত জারজ সন্তান।
হিংস্র এ পিচ্ছিল পথে অন্ধকারে আমাদের ক্লান্ত পরিক্রমা
আমার আকাশে শুধু বেদনার কালো মেঘ জমা।
এ ভীষণ অন্ধকারে একা একা পথ চলে চলে
কেমন করিয়া যেন কোথা হতে মিলেছি সকলে
এখানে এ পথপ্রান্তে মননের সরাইখানায়।
বিত্তহীন মোরা যত বাণীতীর্থে আসিয়াছি রাত্রি তপস্যায়॥

দিনের কর্মের শেষে প্রায়শ্চিত্ত পূর্ণ করি বণিকের পঙ্ক-নর্দমায়
প্রভাতের ঊর্ধ্বনীলে ছুটিতেছি রক্তাক্ত ডানায়।
বিদ্যার মণ্ডপে আজ কৌলীন্যের কুরু পাণ্ডবেরা—
সেখানে নিষাদ মোরা অবজ্ঞাত, কুলহীন ব্যর্থ-লাঞ্ছিতেরা।
বাণীর দেউলে আজ দম্ভী দ্রোণ রাজগুরু দিতেছে পাহারা
একলব্য কেঁদে যায়—নিষ্করুণ নাই কারো সাড়া।
এখানে মিলেছি মোরা ব্রাত্য যত কুলপাংশু মানুষের দল
অনির্বাণ আশা ছাড়া আর কোনো নাই তো সম্বল।
নীড়ভ্রষ্ট যাযাবর কেন খোঁজো নীড়ের আশ্রয়?
শ্রেয় যাহা সত্য হোক প্রেয় নয় প্রেয় কভু নয়।
আমরা চণ্ডাল, ব্রাত্য, অস্পৃশ্য যে মনে রেখ বৈশ্যের বিধান
জীবনের পথে পথে এ অসত্য করে যাব মোরা অপ্রমাণ।

আমাদেরই পথ চেয়ে কাঁদিতেছে ভূলুণ্ঠিত ম্লান ইতিহাস
চতুর্বেদ স্রষ্টা মোরা গোত্রহীন, কুলপাংশু দ্বৈপায়ন-কৃষ্ণ-বেদব্যাস—
মৎস্যগন্ধা জননীর কামাচারী পরাশর-শিশু।
সমাজে অবৈধ মোরা ক্যালভারীর ক্রুশে বিদ্ধ মৃত্যুঞ্জয়ী যীশু।

ইতর-আত্মজ মোরা অব্রাহ্মণ শূদ্র অপাংক্তেয়
রচিতে হইবে তবু ব্রাহ্মণ-সংহিতা-মন্ত্র বেদ-ঐতরেয় ।
'চরৈবেতি' সাধনার মন্ত্র-দ্রষ্টা যুগন্ধর তুমি
তোমারই প্রার্থনা করে দিশিদিশি ক্রন্দিত এ সু-সবিত্রী ভূমি ।
একলব্য-সাধনায় পূর্ণাহুতি আজও আছে বাকি ।
আমার তপস্যা যদি বিঘ্ন করে কৌরবের সারমেয় ডাকি,
অব্যর্থ আঘাতে মোরা শুদ্ধ করি দেব তার স্বর,
সাধা মোর সাধনায় আমি স্থির আপন-নির্ভর ।
বোধির সাধনা মোর আমি বুদ্ধ 'ইহাসনে শুষ্যতু শরীর'—
প্রেমের বন্ধন খোল, লও তুলে বল্কল ও চীর ।
প্রবৃত্তি-রাহুল কাঁদে প্রেয়-গোপা বিচ্ছেদে আকুল
আমার দৃষ্টিতে শুধু বোধিবৃক্ষ, নিরঞ্জনা কূল ।
হীন, ব্রাত্য, অন্ত্যজ-চণ্ডাল
তবুও আমারি হাতে সুপবিত্র জীবনের জ্বলন্ত মশাল ।
ওদের রচিত বাধা দুঃখ-ঝড় আসুক নামিয়া
আগামীর ইতিবৃত্তে যাব মোরা বিশ্বাসের গড়া ঝলসিয়া ।
ভয় নেই ওগো যাত্রী বীর-শ্রেষ্ঠ নচিকেতা তুমি
মৃত্যুরে জিতিবে স্থির মৃত্যুর অধর-প্রান্ত চুমি' ।
উচ্ছৃঙ্খল বিধাতার ত্যাজ্যপুত্র যে আছ যেখানে
বাড়াও বলিষ্ঠ পদ, শয্যা ছাড়ো,— আলোকের সূর্য-তীর্থপানে ।

হে পৃথিবী!

"It is the Ploughman who discovered the Virgin Soil and unto them the civilization was born; and on...was exploited by the Priests, Princes and Profiteers repeatedly. Now it is his turn to break the chains and stand up."

হে আমার ভুবন-মোহিনী অনন্ত-যৌবনা পৃথিবী প্রিয়া!
সত্যই কি তুমি বীর-ভোগ্যা, অর্থশুল্কা স্বৈরিণী!!
ভুলে গেছ আমায় একেবারে?
আমার গলায়ই তো একদিন পরিয়ে দিয়েছিলে স্বয়ম্বরের মালা!
মনে কি পড়ে না তোমার প্রথম যৌবনের সেই সোনালী দিনগুলি?
কত জ্যোৎস্নাপ্লাবিত নিশীথ রাত্রে
তোমার বুকে কান পেতে শুনেছি সৃষ্টির প্রণবমন্ত্র।
গ্রীষ্ম-দুপুরের সূর্যদগ্ধ প্রান্তরে দাঁড়িয়ে
ঊর্ধ্বাকাশে যুক্তকণ্ঠে করেছি আষাঢ়-প্রার্থনা।
তুমি আমার নর্মসহচরী হে মাটি!
প্রথম প্রভাতের অস্পষ্ট ছায়াতে তোমায় আমায় দেখা:
তোমায় আবিষ্কার করেছি, উদ্ধার করেছি—সৃষ্টি করেছি আমি
উপেক্ষিত যৌবনের ব্যথিত ক্রন্দন থেকে—।
অপূর্ণ, অসমাপ্ত, রুক্ষদেহে তখনো আসেনি যৌবনের উজ্জ্বলতা,—
উপেক্ষিতা—লাঞ্ছিতা—তাপদগ্ধা পৃথিবী!
অস্পৃশ্যা, অন্ত্যজা ছিলে সেদিন ওদের সবার কাছে— সেই শিকারীগুলোর
—আজ যারা তোমার যৌবন-তীর্থের অতিথি।
সযত্ন-প্রেমস্পর্শে মুছিয়ে দিয়েছিলাম তোমার অশ্রুর স্বাক্ষর
তোমার ক্ষত-লাঞ্ছিত দেহে বুলিয়ে দিয়েছি স্নেহের প্রলেপ,
রুক্ষ চুলে সাজিয়ে দিয়েছিলাম পুষ্প-মঞ্জরী—
তন্বদেহে তুলে দিয়েছিলাম সবুজ স্নিগ্ধ চেলাঞ্চল
স্বর্ণপীত উত্তরীয়,—রত্নখচিত কঞ্চুলী।

বিকচ-দেহের দেহলীতে নেমে এল শ্যামল যৌবনের মধুশ্রী
তন্বু-দেহের শিখরে শিখরে যৌবনের বিজয় দুন্দুভি :
উরুতে-উরসে-নিতম্বে-কটিতটে উদ্ধত নিটোল পরিপূর্ণতা
ঐশ্বর্য-মহিমায় পূর্ণ হয়ে উঠলে তুমি,—
আমারই প্রেমমন্ত্রে সর্বরোগমুক্তা, স্বস্তি-শ্যামলা পৃথিবী !
মিলন-রাত্রির বাসর-শয্যায় আমরা ছিলাম স্বস্তিস্বপ্নে
তুমি আর আমি হে আমার ধরিত্রী দয়িতা !
প্রেম-সৌভাগ্যে, ঐশ্বর্য-সম্ভারে পরিপূর্ণ আমাদের সংসার ।...

হঠাৎ বুড়ো পুরুতটা এল কোত্থেকে তার চেলা-চামুণ্ডা নিয়ে
আমাদের প্রেম সংসারে চালাল কালো অভিযান,
তুক-তাক্ যাদুমন্ত্রে কেমন করে ছিনিয়ে নিল তোমাকে ।
বশীকরণের মন্ত্রধূমে আচ্ছন্ন হল আমার প্রেমারক্ত আকাশ,
সামনে জ্বলছে একটা আগুনের কুণ্ড
আলোহীন একটা অসহ্য উত্তাপে ছেয়ে গেছে বাতাস—
শ্বাসরুদ্ধ আমার সমস্ত শক্তি গেল অসাড় হয়ে ।
অবোধ্য কী সব মন্ত্র পড়ে গেল অদ্ভুত বিকৃত স্বরে,
পেশীবহুল হাত দুটো আমার ইতিমধ্যে বেঁধে দিয়েছে ওরা
পায়ে পরিয়ে দিয়েছে লোহার মোটা শেকল ।
আমার চোখের সামনে ওরা তোমায় টেনে নিল কোলে :
লোলচর্ম পুরুতটা শীর্ণ হাতে স্পর্শ করল তোমার কটি,
কোমল অধরে চুম্বন করল ব্যাধিগ্রস্ত বুড়োটা
কোটর-চক্ষু, পাণ্ডুর টোল-খাওয়া দুর্গন্ধ মুখটা নীচু করে ;
জটালো নোংরা দাড়িগুলোতে কিলবিল করছে পোকা ।
হাড়-বের-করা মুখে কামনার নির্লজ্জ হাসি ।—
দেখলাম, শিউরে উঠল তোমার দেহ ওর পঙ্কিল স্পর্শে ।

ইচ্ছে হল ওর ঐ বিরল-কেশ সাদা মাথাটা গুঁড়িয়ে দেই,

শির-তোলা ন্যস্ত হাতটা ছিঁড়ে ফেলি পাখীর পালকের মত।

আমার শরীরের অণু-পরমাণু গর্জন করে উঠল প্রতিশোধ-স্পৃহায়

শেকল উঠল ঝনঝনিয়ে,—বুঝি ভাঙে!

পাণ্ডাগুলো তেড়ে এসে ছিটিয়ে দিল মন্ত্রপূত জল—

নিঃসংজ্ঞ হয়ে পড়ে গেলাম মাটিতে—স্নায়ুতন্ত্রী আমার অবশ।

উটের পিঠে—গোরুর গাড়ীতে তোমায় নিয়ে চলে গেল ওরা…॥

শতাব্দীর পর তন্দ্রার ঘোর কাটলে দেখলাম:

এসেছে আর এক ভীষণকায় দস্যুর দল—

তেজী ঘোড়ার পিঠে আসন বিছিয়ে, হাতে নিয়ে সুতীক্ষ্ণ বর্শা।

কটিতে ধারালো কৃপাণ, মাথায় ঝলমলে শিরস্ত্রাণ

সর্দারটা এগিয়ে এল, মুখে তার বীভৎস হিংস্রতা।

বিশাল বুকে শক্ত আচ্ছাদন,—দৃঢ় হাতে লাগাম,—

ঘোড়া থেকে নেমেই রোগা পুরুতটাকে মারল এক থাপ্পড়

ঘুরে পড়ে গেল সিংহাসন থেকে মাটিতে।

হুমড়ে ঝোলাটা ছিটকে পড়ল একপাশে

পাখীর পালক, হাড়গোর, শিল-নোড়া কী সব পড়েছে বেরিয়ে—

দস্যুগুলো মাড়িয়ে গেল অবজ্ঞাভরে।—

মাথাটা গেছে ফেটে, শিথিল ঠোঁটটা গেছে থ্যাতলা হয়ে…।

পাণ্ডাগুলো যারা আক্রমণ করতে এল ক্রুদ্ধ আক্রোশে

তাদেরও গতি হল বোকা পুরুতটার পথে;

রইল যারা সুরু করল ভয়ে ভয়ে স্তুতিগান বিজয়ী দস্যুটার:

"পুণ্যকৃতাং…শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে॥"

তুমি নত নেত্রে দাঁড়িয়েছিলে, ভয়ে কাঁপছিলে একপাশে,—

সর্দারটা হ্যাঁচকা টান মেরে তুলে নিল বুকের মধ্যে।……

কামনার দংশনে তোমার সর্বাঙ্গে গড়িয়ে পড়ল রক্ত-ধারা।

তোমার নরম বুকে দস্যুটা হাত চালাল কসাইয়ের মত—

রক্তাক্ত হাতে মানুষ-পচা দুর্গন্ধ, ঘৃণায় মুখ ফেরালে তুমি,

অসম্মতি জানালেই উঁচিয়ে ধরে চক্‌চকে বল্লম।.... ..

তোমার অসহায় সজল চোখ আমি দেখলাম,—

আর একবার শেকল ভাঙার স্বপ্নে ফুলে উঠল আমার দেহ।···

অমনি সঙ্গত্র শরের বিষাক্ত আঘাতে শুইয়ে দিল মাটিতে,

উদ্ধত তীরের শাণিত ফলায় কুচিলার বিষ।—

ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটল ক্ষতমুখ থেকে।

ওদের নিষ্ঠুর বিকট অট্টহাস্যে কেঁপে উঠল বনপ্রান্তর—

উলঙ্গ তোমাকে বক্ষলগ্ন করে ঘোড়ার পিঠে উঠে বসল সর্দারটা।—

ধুলো উড়িয়ে চলে গেল দস্যুগুলো।

তপ্ত অশ্রু গড়িয়ে পড়ে, অসাড় হয়ে আসে অনুভূতি :

কেটে গেল কত রাত্রি—কত দিন -কত বছর—কত যুগ !!

চেতনা ফিরে এলে দেখলাম, নতুন কারা সেই সিংহাসনে !

স্থূল মাংসের স্তূপে মানুষটা পড়েছে চাপা,

লোভের পঙ্কিল পিচ্ছিলতা ওদের খুদে খুদে ধারালো চোখে

কামনার শিখায় অন্ধকারেও জ্বলছে।

এখানে ওখানে মেদ-বহুলতার শিথিল বিকৃতি

প্রকাণ্ড ভুঁড়িটায় উৎকট স্বেদ-গন্ধ, যৌবন-চিহ্ন লুপ্ত।

ওদের একটা অতিবৃদ্ধ মাংসপিণ্ড আজ সিংহাসনে ;

কালো, পুরু লালাসিক্ত ঠোঁটে কামনার কদর্য লোলুপতা

কোলে তুলে কুকুরের মত চাটছে তোমার রক্তাভ কপোল

মোটা লোমশ হাতে বেষ্টন করেছে তোমার শুভ্র গলা।

সামনে টাকার থলেতে ঝক্‌ঝক করছে কাঁচা মোহরগুলো,

ওপরে সাজান রয়েছে দাঁড়িপাল্লা আর বাটখারা।

ঝক্‌মকে সোনার গেলাসে টলটল করছে টাটকা রক্ত !···

আমারি চোখের সামনে হে পৃথিবী !

তোমার ওপর এমনি অত্যাচার করেছে ওরা দলে দলে।

যুগান্তের প্রথম প্রভাতে সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রাণপণে

খুলে ফেলেছি আজ সহস্র বছরের ভীষণ লৌহ-বন্ধন ;

সর্বাঙ্গে আমার কালো শেকলের রক্তাক্ত ক্ষতচিহ্ন।

আমার ঘরে কি আর ফিরে আসবে না তুমি ?

স্বার্থান্ধ বণিকের স্বর্ণসম্ভারেই কি তৃপ্ত তোমার চিত্ত ?

আসবে জানি তুমি, আসবে হে পৃথিবী-প্রিয়া !

তোমার জীবনের ধ্যান-পূর্ণতা তো এল না আজো,—

বন্ধ্যা, সৃষ্টিহীন হয়ে রইলে এতকাল !

নিষ্ঠাহীন কাম-ব্যাভিচারে ফোটে না সৃষ্টি-শতদল।

মত্ত-মাতাল দানবের দল কাড়াকাড়ি করেছে তোমাকে নিয়ে,

ছিন্ন-ভিন্ন করেছে তোমার দেহটাকে ;

তোমার প্রাণ-সত্তাটি জাগাতে পারেনি কেউ।

ওদের বিকৃত বীর্য গ্রহণ করেনি তোমার সঙ্কুচিত সৃষ্টিকোষ॥

সহস্র রাত্রির ব্যাকুল ক্রন্দন জমে আছে তোমার বুকে,—

আমি জানি, আমি তা জানি হে আমার পৃথিবী-প্রিয়া !

কে বলেছে তুমি বহুভোগ্যা ? আপ্তকামা ?

তোমার অন্তরে রয়েছে অক্ষত কুমারীর অনির্বাণ নিষ্ঠা—

তুমি আমার চিরকালের একান্ত-বল্লভা—আজন্ম সঙ্গিনী !

কামার্তের ভ্রষ্টাচার নয়, এ যে আমার প্রেম-প্রার্থনা !!

পশুগুলোর কাম-স্পর্শে অশুচি হয়ে আছে তোমার দেহ মন

চোখের কোনে জমে আছে কালো রাত্রির অভিশাপ।

প্রেমের আরোগ্যস্নানে মুক্ত করব তোমায় হে পৃথিবী !

আমার স্নেহ-নিবিড় স্পর্শে মুক্ত হবে তোমার সর্বগ্লানি অবসাদ।

তোমার সঙ্গে মিলন হবে বলেই বেঁচে আছি আজো।

তুমি এস আমার নবতর বাসর-শয্যায় হে পৃথিবী!

আবার আমরা সৃষ্টি করি শ্যামশষ্প, সহস্র-প্রাণ তৃণাঙ্কুর

নতুন ফসলে আবার পরিপূর্ণ হোক তোমার সংসার।

ভয় নেই, এবার সুরক্ষিত হয়েই সুরু করব জীবন:

ওদের বিষাক্ত দাঁত আর ধারালো নখর ফেলেছি তুলে

বণিকের স্বর্ণদম্ভ মিলিয়ে গেছে ব্যর্থতায়—

ওদের তুকৃতাক মন্ত্রের ভেলকি এবার ধরে ফেলেছি—

জেনেছি ওদের দম্ভ-আস্ফালনের শূন্য-গর্ভ ইতিহাস।

ওরা ভীরু, শক্তির বড়াই ওদের মিথ্যা;—

বিরাট একটা সশস্ত্র স্থবির পাহারা দেয় ওদের দুর্গ।

দুঃখ কর না: প্রথম প্রভাতের জাগ্রত যৌবন

আবার ফিরে আসবে তোমার শ্যামল তনুর শিখরে শিখরে।

সোনা ধানের, বোনা ধানের স্বর্ণোত্তরীয় পরিয়ে দেব তোমার দেহে

মানুষ বাঁচবে, বাঁচবে তোমার সহস্র শিশু।

সৃষ্টি বর্ণালীতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে দিগদিগন্ত—গানে, গন্ধে।

আকাশে বাতাসে ঐ শোনো বেজে উঠেছে আবার

আমাদের সেই প্রথম মিলনের আনন্দ-সানাই,

সেই প্রথম প্রভাতের হীরে-ঝলমলে সুস্নিগ্ধ রোদ্দুর।

আবার আমি বসব সিংহাসনে, তুমি আমার পাশে॥

ইচ্ছে খুশী

ইচ্ছে খুশী জীবনটা মোর ফুরিয়ে দেব,
তুড়িয়ে দেব   ঘুরিয়ে দেব।
জীবন আমার ঊর্ধ্বপথে নীল আকাশে
চলবে ভেসে   ফুল্ বাতাসে।
উড়ে যাবে খুশীর স্রোতে মেঘের পাশে
ঊর্ধ্বশ্বাসে   এক নিশ্বাসে॥

চিরন্তনী সুতো হাতে থাকবে না তো,—
পাখীর মতো   মেঘের মতো
অসীম নীলে   উড়িয়ে দেব ইচ্ছে শত
চলবে দ্রুত   খেয়াল মতো॥
পক্ষিরাজ ঘোড়ার মতো   চলব দ'লে
স্থলে জলে   পাহাড় তলে।
থামব না তো   ক্ষণিক কভু ঝড়-বাদলে
ছায়ার তলে   বন-জঙ্গলে॥

মন-ঘোড়া মোর   একলা চলে লক্ষ্যহীন
লাগামহীন   খুশ স্বাধীন,--
চলার তালে   পরাণ নাচে   তাধিন ধিন।
বিরামহীন   শূন্যে লীন॥

নিজেও আমি বুঝতে না চাই
কীইবা চাই,   কীইবা নাই।
জীবনে মোর লেনা-দেনার হিসেব নাই
(কেবল আছে) ইচ্ছেটাই —চলতে চাই॥

সত্যিই তো! জীবনে মোর ধর্ম নাই—
কর্ম নাই মর্ম নাই,
মিথ্যা অলীক চলতি-নীতির বর্ম নাই।
ঘর্ম নাই হর্ম্য নাই॥

নিষেধ বাধার নিত্য ডোরে বারে বারে
জীবনটারে বাঁধব না রে।—
(হাসির মতো) জীবনটা মোর গড়িয়ে দেব
(ফুলের মতো) ছড়িয়ে দেব
(খুশীর সাথে) জড়িয়ে দেব।
সংস্কারের ভিতগুলি সব নড়িয়ে দেব
সরিয়ে দেব ধরিয়ে দেব॥
পৌঁছে যাব নীল পাহাড় আকাশচূড়
অনেক দূর দীপক সুর!
ছাড়িয়ে যাব মর্ত্যসীমার 'সু' ও 'কু'র
'আহা'-'উঃ'র কালো-এ-ভূ'র॥

ইচ্ছে হলে জীবনটাকে পুড়িয়ে দেব
গুঁড়িয়ে দেব মুড়িয়ে দেব
কালো কঠিন মৃত্যু সাথে হাত মেলাব।
জীবন দেব হার না যাব॥
আতশ বাজির মতই আমি হবরে ছাই
দেখব তাই ফূর্তি পাই।
কয়েক পলক ফুলকি উড়ে আর তো নাই।
এগিয়ে যাই যেদিক পাই॥
জীবনে মোর কোথাও কভু সন্ধি নাই—
চিন্তা নাই খিন্নতা নাই···॥

দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ

"দুঃখৈর দুঃখম্। নাত্র দুঃখমস্তি"……

কামলুব্ধ ব্যভিচারী আমি দুঃশাসন
দুই হাতে প্রাণপণে টানিতেছি সৌন্দর্যের দুকূল-বসন।
কিছুতেই তৃপ্তি নাই রক্তে রক্তে কামনার ধূম্রনীল শিখা
ভালে মোর বাসনার রাগরক্ত টিকা ;
সৌন্দর্য-এষণা মোর সহস্র তরঙ্গভঙ্গে কূল-প্লাবী ওঠে উচ্ছ্বসিয়া
ক্ষুদ্র এই দেহ-তটে মুহুর্মুহুঃ পড়িছে ভাঙিয়া।
পঞ্চস্বামী সোহাগিনী মৃন্ময়ী এ পাঞ্চাল-দুহিতা
রূপে-রসে-গন্ধে-স্পর্শে তনুখানি সু-কোমল পুষ্প পল্লবিতা—
তার স্পর্শ সে কেমন দেখিবারে সাধ ;
রূপ-পাঞ্চালীরে চাই নগ্নবক্ষে বহুকামী আমি রূপোন্মাদ !—
স্তন-কুম্ভে কী অমৃত আছে—
অধরের পুষ্প-পাত্রে কত মধু !—ইচ্ছা-ভৃঙ্গ অহরহ যাচে।
মেখলার মোহচ্ছায়ে নীবিবন্ধে সুপ্ত আছে কোন স্বর্গখানি ?—
অমোঘ তাহারি কর্ষ নিতেছে আমারে নিত্য টানি।
মৃন্ময় মাটির বুকে সৃষ্টিরূপা সহস্র দ্রৌপদী
অভিকামী আমি তার—তারই সাথে পরকীয়া রতি ;—
সে সতীরে চাই মোর পঞ্চমাঙ্ক ক্লান্ত কামায়নে
কামাচারী, বস্ত্র টানি তাই প্রাণপণে।

উল্কাসম ছুটিতেছি তৃপ্তি আসে কৈ ?
বাসর-শয্যায় শুধু নিরর্থক রতিযুদ্ধ চলে রক্তক্ষয়ী :
দেহের অর্গল ভাঙি দুই হাতে নখরে দংশনে
সুধার সমুদ্র-তীর্থে নিরুপায় ছুটে চলি সুনিবিড় দৃঢ় আলিঙ্গনে।
অঙ্গে মোর সুখ নাই, আমি চাই সীমাহীন ভূমা—
নিষ্পেষিয়া, আলিঙ্গিয়া, দলিয়া, পিষিয়া
সর্বাঙ্গে আঁকিয়া দেই রক্তঝরা-চুমা।

অনির্বাণ তীব্র ক্ষুধা জ্বলিছে অন্তরে
দেহের দরিদ্র হ্রদে মোর তপ্ত ইচ্ছা শুধু শুধুই সন্তরে।
উপরতি নাই তবু কাম ব্যাভিচারে
তৃপ্তি লোভী দস্যু আমি বার বার হানা দেই ভোগের দুয়ারে।
পৃথিবীর পথে পথে পাঞ্চালীর মোহমুগ্ধ তনুর হিল্লোল
স্তনভার-নম্র দেহ, সুবঙ্কিম কটাক্ষ বিলোল,
নিবিড় নিতম্ব-ঘন শ্রোণি-ভারা নিম্ননাভি বিপুল-জঘনা
সুমধ্যমে বলিত্রয়, করভোরু ললিত ললনা —
রাগরক্ত ওষ্ঠাধরে মৃদুমন্দ হাসি :
হাতছানি দিয়ে ডাকে, বক্ষে মোর কামবহ্নি ওঠে গো উচ্ছ্বাসি।
কী করিব ! কেমনে মিটাব বল সর্বগ্রাসী সর্বনাশা ক্ষুধা
সীমিত ভুবন-স্বর্গে আছে কি রে আছে এত সুধা ?

সমস্ত ভুবন ভরে দ্রৌপদীর দেহগন্ধ, স্বর্ণচাঁপা শাড়ী
বাসনা বর্শায় যেন চক্ষু তারে নিয়ে আসে কাড়ি'—
হৃদ্বের হস্তিনাপুরে কামনার কৌরব সভায়।
পঞ্চস্বামী সাথে কৃষ্ণা দিগন্তের ইন্দ্রপ্রস্থে যায় ;—
দুহাত বাড়ায়ে ছুটি সেই লক্ষ্যে, বহ্নিরাঙ্গা লোলুপ রসনা
আমি মুগ্ধ কৃষ্ণা-প্রেমে হারায়েছি সংবিৎ, চেতনা।
আমার কামনা তাই দুঃশাসন দ্রৌপদীর বস্ত্র ধরি টানে
ভোগের কৌরব সভা চেয়ে আছে অর্ধনগ্ন পাঞ্চালীর পানে।
কর্তব্যের ধৃতরাষ্ট্র চক্ষু মুদে, পিতামহ হতবাক্ নতশিরে বসে
সৌন্দর্য-কৃষ্ণার চোখে ঝরঝর বেদনার তপ্ত অশ্রু খসে।
ভীমরূপী মহাকাল জানি জানি গদাহস্তে রয়েছে উদ্যত,
এ মাটির কুরুক্ষেত্রে পূর্ণ হবে পাঞ্চালীর রক্তস্নাত ব্রত
কীর্তিনাশা শ্মশানের শাণিত শিখায়,
মুগ্ধ তবু মত্ত নিরুপায়।

মুক্তির মোয়া

ভগবানই যদি সৃষ্টি করে থাকেন দুনিয়াটা
মুক্তির ভারটাও তাঁর ওপরই ছেড়ে দিলে পারতে ;
পরকালের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে ঘানি টানতে হত না।
সৃষ্টির প্রয়োজন যাঁর, মুক্তির দায়টাও তাঁরই।
তাছাড়া, তাঁর ভাব-সাব দেখেও তো মনে হয় না
মুক্তির মোয়াটা কোনো সৃষ্টিছাড়া স্বর্গের শিকায় ঝুলছে !
মুক্তির কুড়ুল নিয়ে তবু পরমহংসেরা সব জন্ম নিলেন এদেশেই,
হায়রে ! মাটিতে লাঠি খেয়ে স্বর্গে যাবে পিঠে !
গেরুয়ার মুঠোয় চ্যাপ্টা হয়ে গেল গোটা ভারত
কঁকিয়ে কুঁকড়ে উঠল বার বার। কে শোনে কান্না !
মুগুর নিয়ে লম্ফঝম্প সুরু হয়ে গেছে তখন মঞ্চে—
চারিদিক থেকে খালি হাততালি আর বাহবা !
দেখছ না ! কেমন পা উঁচুতে তুলে মাথায় হাঁটতে শিখেছে
ধন্য ধন্য ! এমন না হলে হয়, সাবাস !! পারবে কেউ ?
ক'ষে কৌপীন এঁটে নপুংসক হবার বাহাদুরিতে
নেড়া-নেড়ীর দলে নাম লেখাল সব। সৃষ্টি করবে কারা ?
সোনার জমি পতিত হয়েই রইল ; আবাদ করার লোক নেই।

চৌদ্দটা জাঁদরেল জাতের ওপর থাবা মেরে যারা
আপন ক্ষমতায় আসন পেতে বসেছিল একদিন।
যাদের মন্ত্র ছিল 'চরৈবেতি'— এগিয়ে চল থামব না
গতির উৎসাহে যারা ভাসিয়ে দিল জড়ের নৌকোগুলো,
যাদের অগস্ত্য বুড়ো বিন্ধ্যের মাথাটা নুইয়ে দিল লাথি মেরে—
সিন্ধুকূল থেকে কন্যাকুমারী দীক্ষা নিল যাদের কাছে।

ময়দানবের মুখে 'টু' শব্দটি নেই,

লঙ্কার রাক্ষসেরা মাথা নীচু করে পায়ের তলায়—

একই সুরে সবাই বললে 'সদ্‌গময়—জ্যোতির্ময়'।

দেবতার আসনে বসে শাসন করল যারা জনপদ,

সাগরের ঝুঁটি ধরে যাদের বাণিজ্য-তরী ছুটল দেশ-দেশান্তরে

মিতালি গড়ল যারা সাগর-পারের দ্বীপে—।

লাঙলের মুখে ফুল ফোটাল, প্রস্তরে প্রস্তরে প্রাসাদ।

সভ্যতার সোনার তরীতে ফসল তুলেছে যারা দুই হাতে

মাটি থেকে—আকাশ থেকে—জল থেকে।

প্রজ্ঞা আর পশুর সঙ্গে যারা কামনা করত অর্থ ঐশ্বর্য

পুঁথির সঙ্গে পাহারা দিয়েছে পায়ে-চলার পথ।

যারা শান্তির প্রয়োজনে হিংস্র হতে পারত শ্বাপদের মত,

বুকের মশালে আগুন ধরাতে হত না দেরি

অন্যায় আর অসত্যকে জ্বালিয়ে দিতে, পুড়িয়ে ফেলাতে।

বাঁচতে জানত মানুষের মত,-পঞ্চকোষী মানুষের মত।—

সেই বিরাট অগ্নিগর্ভ পাহাড় প্রসব করল মূষিক,—

গোটা কয়েক বিদেশী পাগলা নেকড়ের ভয়ে

ঘরবাড়ী ছেড়ে মুখ লুকাল গিয়ে গর্তের তলায়।...

লুটপাট হৈ-হুল্লোর চলল কয়েকশ' বছর...

তাদের চেতনা নেই; ভেলকির আখড়ায় নেশা করে বুঁদ,

জ্বলন্ত মোয়াটার দিকে চেয়ে লালা ঝরছে তখনো।

পৃথিবীর প্রেতগুলো পাঁয়তারা কষছে স্বর্গে যাওয়ার।

ফল-মূল-খেকো বৈরাগী বানরগুলো যদি কিচ্‌মিচ করতেও জানত,

উন্মার্গের উঁচু ডালে লাফিয়ে উঠেও যদি

বাঁচতে পারত বুঝতাম; হায়রে! পুড়ে মরল সব।

রইল যারা লেজ কেটে, চোখ কান খুইয়ে

তারাও সব আধ-মরা ভিক্ষুক,—মানুষের বাজ।

নারমাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ

একটি মেয়ের অপমানের প্রতিশোধ নিতে
শত্রু-শিবিরে আগুন দিল যারা নির্মম হয়ে ;—ক্ষমাহীন।
আঠার অক্ষ সেনা পুড়ে গেল ছাই হয়ে
অশ্ব, রথ, গজ, পদাতিক যে কত,—হিসেব নেই তার।
তারাই আজ চোখের সামনে ধর্ষিত দেখেও মা-বোনকে
নড়ে না ; ভিজে বারুদের মত জ্বলে না।
সাতেরোটা ঘোড়-সওয়ার এসে থাপ্পড় মেরে ফেলে দিল....।
তোমার গড়া বাসরে রাত কাটাল তোমার প্রিয়াকে নিয়ে,
সাজানো বাগান তছনছ করে দিল উচ্ছৃঙ্খল পদপাতে।
তোমরা তখন খোল-করতাল নিয়ে মেতে আছ
সাহিত্যের নর্দমায় 'কলসীর কানা' খেয়েও প্রেম বিলাতে ব্যস্ত।

তারপর সেই আম বাগানের অমানুষিক কাণ্ডটা :—
তোমরা পেছনে দাঁড়িয়ে চুপচাপ মজা দেখলে
আর ওরা মোয়া-লোভীদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিল শেষ ক্ষমতাটুকু।
তোমরা দুর্গা-অবতার মহারাণীর বন্দনা গাইলে
আর ওরা নির্বিবাদে লুঠে চলল একের পর এক।
দিল্লীশ্বর হল জগদীশ্বর, ভগবতী হলেন মহারাণী—
কাকের ভাগ্যে জুটল না উচ্ছিষ্ট ছাড়া আর কিছুই।
স্বজনের ফাঁসি দেখে গঙ্গাস্নান করে ঘরে ঢুকলে,
পাপ কি এতে গেল ? তাছাড়া ঘর কোথায় ?
ঘর-বাড়ী জমি-জমা—সবই যে তোমার নিলামে।
মালা টিপে তো বাদা পরেছ, কিন্তু মুক্তি কি এল ?
ধর্ম নেই, অর্থ নেই যার মোক্ষ তার কোথায় !
যে দর্শন মানুষের মত বাঁচাতে পারল না এই পৃথিবীতে
সে যে কোন স্বর্গের পথ দেখাবে জানি না ! সেটা স্বর্গ তো ?

কিন্তু যারা তোমাদের,— যে আদি মানব মানবীরা
সযত্নে বুকে করে বাঁচিয়েছে, গুহার অন্ধকারে
হিংস্র শ্বাপদের কামড় থেকে—বর্ষাবিদ্যুতের আক্রমণ থেকে,—
তারা কাঁদছে,—কাঁদছে তোমার রক্তের মধ্যে · শুনছ না!
কাঁদছে সেই বাল্মীকি-বেদব্যাস-কণাদ-কৌটিল্যেরা—
যাঁদের উত্তরাধিকার সদম্ভে ঘোষণা করছ বিশ্বের দরবারে।

আয়নায় চেয়ে দেখেছ? কী ছিলে আর কী হয়েছ?
খিদে লাগলে কাঁদার স্বাভাবিক অধিকারও আজ নেই!
বাটখারা ফেলে দণ্ড ধরেছিল,—আবার বাটখারা!
ঘর ছেড়ে তো পালিয়ে এলে, পালাবে কোথায়?
কালাপানির নীতি আর কতকাল?
গান্ধার কন্যা তো পরদেশী হয়ে গেছে কবে!
এর পর বাঙালীকেও বোরখা পরাবে।
খদ্দর লুঙ্গিতে বুঝি চোখ ধাঁধিয়েছে?
না-বালকী মন আবার হাত পা গুটিয়ে বসেছ নিশ্চিন্ত হয়ে;
ভালো করে চেয়ে দেখ কোট প্যাণ্টুলান উকি দিচ্ছে!
আকাশের দিকে চেয়ে তো অনেক দিন গেল
ভূমার লোভে ভূমিটুকুও হারালে:
লোকায়ত চার্বাককে তো একদিন মাটি-চাপা দিয়েছ;
অনেক ছোবল তো খেলে, নেশা কি ভাঙল না?
জোয়ালের ভারে যে ঘা হয়ে গেছে, হুঁশ কি আর হবে না?

নতুন চার্বাকরা উঠে এসেছে কবর থেকে আবার:
এরা শুধু নিজেরাই ঘি খায় না,
সবার পাতে যাতে ঘি পড়ে তারও ব্যবস্থা করে,—তারাই।

কাঁসারের কড়াই, কুমোরের হাঁড়ি

ছুতোরের চরকি আর গোয়ালার শক্ত হাত—

তবেই না লাল টুকটুকে ঘি হয়ে আসে সবার পাতে।

নেশা তো করলে! পরকাল থাক, রুটির যোগাড়ও হল না।

বাঁচতে চাও, স্বর্গের সংস্কার ছেড়ে মাটির কথা ভাবো

মাটিকে যারা ভালোবেসেছে তাদের পেছনে দাঁড়াও।

ভিক্ষে করে তো দেখলে, না ভরল পেট না এল মোক্ষ,

হাত আর না মেলে এবারে মুঠো করতে শেখো—

পৃথিবীর পথে অন্তত হোঁচট খেয়ে মরবে না

আর গায়ে যদি জোর থাকে

স্বর্গের দুয়ারের খেঁকী কুকুরটাকে তাড়িয়ে

ঢুকতে পারবে সেখানেও; 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'।

শঙ্খিনী

যুগ্ম শঙ্খে এনেছ কি সোম ওগো শঙ্খিনী নারী—
কোন স্বরগের সঞ্জীবনী গো কোন সাগরের বারি !
অতি সযতনে বক্ষে আবরি'
কিবা অপরূপ আহা মরি মরি
চন্দন মাখা শুভ্র শঙ্খে জীবনের মঞ্জরী !
মূর্ছিত দেহে মাধুর্য মায়া অমৃত পড়ে ঝরি ॥

স্বপ্নের মত পেলব-মধুর আপেলের আল্‌পনা
কুন্দের গায়ে কে টানিয়া দিল গোলাপের মূর্ছনা।
কিশলয়-রাঙা শঙ্খ যুগল
দোল চঞ্চল উচ্ছল ছল
প্রাণ-তরঙ্গ উদ্বেল হয়ে ভাঙিয়া পড়িবে বুঝি।
যৌবন মধু ফুল-শঙ্খের অন্তরে আছে পুঁজি ॥

প্রথম উষার রক্তিম আভা শ্বেত মন্দির-চূড়ে,
দেহের ধূলায় প্রাণ-অঙ্কুর উঠিতেছে যেন ফুঁড়ে।
দক্ষিণাবর্ত বঙ্কিম গতি
নিটোল নরমে যৌবন জ্যোতি
যুগ্ম শঙ্খ জাগিতেছে যেন হৃদয়-জলধি হতে।
শুভ শঙ্খের মঙ্গল ধ্বনি যৌবন-জয়-রথে ॥

সুন্দর-তৃষা লেহি লেহি জ্বলে অন্তর-অম্বরে,
ব্যর্থ ব্যথায় চক্ষে আমার তিক্ত অশ্রু ঝরে।
তুমি আস সেথা সুন্দরী নারী
মুগ্ধ বক্ষে প্রেম-সুধা-ঝারি
অবিরল ধারে সিঞ্চন করি বাসনা-বহ্নি মম
নেভাও যতনে শ্বেত-সাগরিকা ভোগবতী-ধারা-সম।

আমার আকাশে জাগিছে যে আজ রহস্ত-রামধনু—
তার কথা কেউ পারেনি বলিতে বেদ-গৌতম-মনু।
মনে হয় যেন পেয়েছি পেয়েছি!
সে মহা-সাগরে এই তো নেয়েছি
শুনেছি সাগর-প্রলয়োচ্ছ্বাস তোমার শঙ্খ-মুখে!
ভরে গেছে মোর তনু-মন-প্রাণ স্নিগ্ধ-সজল-সুখে॥

ভুবন-সাগর মথিয়া যে নিতি উঠিতেছে কলগান,
যে অদেখা লাগি কাঁদে প্রাণ মোর তারি মহা আহ্বান
গভীর মন্দ্রে বাজিছে নিত্য,
—মহা সুষমার মহান নৃত্য—
সে সাগর থেকে উঠেছে তোমার শুভ্র-শঙ্খ-প্রাণ।
কান পাতি শুনি তারি মাঝখানে জীবনের সাম-গান॥

পূর্ণ শঙ্খে সঞ্চিত আছে নন্দন-বন-মধু
বাসর কক্ষে তাই চিরকাল উন্দাম বরবধূ।
স্নিগ্ধ শঙ্খে মুক্ত ধারায়
শূন্য যা কিছু ভরে দিয়ে যায়
জীবন-পাত্রে পূর্ণ অর্ঘ্য রচনা করিছ তুমি।
অমরতা লভি অধর-ওষ্ঠে শঙ্খের শির চুমি॥

ফুল-শঙ্খের মুগ্ধ-পরশ যৌবন-মধু-মাসে
আমারে দিয়েছে সুর-মন্দার আনন্দ-উল্লাসে।
দুখের রাত্রি কর অবসান
অঞ্জলি ভরি করি দীপ দান
জীবন-বৃন্তে ফোটাও সূর্য স্মৃষ্টির শতদল।
খুঁজে পায় তীর শান্তির নীড় বাসনা-বলাকাদল॥

যুগে যুগে ওগো শঙ্খিনী নারী তব শঙ্খের বাণী
পৃথিবীর কানে প্রাণমন্ত্রের মহাবীজ দিল আনি ।
তব শঙ্খে কি আরো আছে দান
আরো আরো গান আরো আরো প্রাণ ?
—তাই ক্ষীর ক্ষরে শিশুর অধরে শঙ্খামৃত ধারা !
প্রাণের প্রবাহ ধমনীতে জাগে, জাগে জীবনের তারা !!

বাজাও বাজাও হে প্রাণধাত্রী জীবনের জয়-শাঁখ !
ভাঙাও ভাঙাও স্থবির-প্রাণের মহাঘুমে দাও ডাক !!
মানবক মুখে প্রাণের দীপনী—
সৌর ছটায় আলোক বরণী
ওগো শঙ্খিনী শঙ্খে তোমার ছিটাও শান্তিজল ।
কাম-ভুজঙ্গ নত হয়ে থাক রক্ত-চরণতল ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ

যুগে যুগে যারা বহন করে চলেছে পরাজয়ের গ্লানি—
পুণ্য সঞ্চয়ের আশায় ভিড় করে তোমার দুয়ারে ;
তাগা-তাবিজের ভারে মাথা হয়ে আছে নত
ঝাড়-ফুঁক, তুকতাকে বিশ্বাসী সেই সব মানুষের প্রেত :
তারা তোমায় বুঝবে না কোন ইস্পাতে গড়া তোমার মূর্তি।
ওরাও বুঝবে না দক্ষিণেশ্বরের বলিষ্ঠমনা মানুষটিকে :—
রবিবারের অলস অবসরে যারা বুইক হাঁকায় ট্রাঙ্ক রোডে,
রেডিও বাজায়, প্রেমের নামে নারী-দেহ চটকায় দুই হাতে।—
আর ব্ল্যাকমার্কেটের সঙ্গে তীর্থ করে সমান তালে।
ঘোড়ার লেজে দেবতাকে বসাতে নেই কুণ্ঠা,
সাহেব তুষ্টিতে যারা পাঁঠা মানত করে সোনায় ধাঁধায়
লাভের চুক্তিতে কালীকে ডাকে করজোড়ে।
চেনেননি ঐ মহান ব্যক্তিরাও গেরুয়ায় যারা ভোলাতে চায়
সকাল-সন্ধ্যা ঘণ্টা নেড়ে পূজা করেন অবতার বানিয়ে।
সেই সব পরা-জীবন সর্বস্ব, জীবনদ্রোহীর দল ॥

অলস ভক্তিমার্গের নিদ্রালসা মন্ত্র-কান্না নয়,
সখীভাবে গদগদচিত্ত বৃন্দাবনী বৃত্তির ব্যভিচার নয়,—
তুমি সংস্কারের শুষ্ক মাটিতে এনেছ মনুষ্যত্বের মন্দাকিনী
কূপমণ্ডুক কুঞ্জের জীবের দেশে আবাহন করেছ মানুষকে।
কী বিরাট প্রাণ নিয়ে মাথা নেড়ে বলেছিল সেদিন
কামারপুকুরের আট বছরের ছেলেটি,—
সে জাগ্রত জীবন-বেদ শুনেও শুনিনি আমরা সেদিন।
বীর্যহীন ভক্তির সহজ পথেই এগিয়ে চলি আমরা পালে পালে
পরকালের কমণ্ডলু বোঝাই করতে বুভুক্ষুর আগ্রহে।

দক্ষিণেশ্বরের ভাগীরথী বয়ে গেল বুঝি শুধু শুধুই ।
"আমি ভিক্ষা নেব ঐ অস্পৃশ্য ধনী কামারনীর হাতেই
কী জাত জানি না, ওযে আমার মা—আমার ধাত্রী ।
জীবকে যিনি পালন করেন তিনিও তো মা ....
এতে যদি অশুদ্ধ হয় এ অনুষ্ঠান, প্রয়োজন নেই পৈতের ।"...
নতুন যুগের শঙ্খবাণী উচ্চারিত হল সেদিন : "শৃণ্বন্তু বিশ্বে ....."
ভাতের হাঁড়ি থেকে, ছুঁৎমার্গীর কবল থেকে মুক্ত হল সত্যধর্ম ।
"বল মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই।"
প্রাণধর্মের সে মশালেই উনিশ শো পাঁচ ও বিয়াল্লিশ ।
আত্মমুক্তি বড় কথা নয় এই নবতর জীবন-ন্যাসে
"বহুজনহিতায় বহুজন সুখায়"-ই জীবন চায়
কালীর হাত ধরে পেয়েছিলে যারা মত । [illegible] ভক্তির [illegible],
মরা হাড় ছুঁইয়ে ভেলকি দেখাতে চায়—
দক্ষিণেশ্বর তাদের জন্য নয়,—[illegible] ।
তাদের জন্যে তো হাজারো ফকির-সন্ন্যাসী রয়েছে এই হতভাগা দেশে ॥

মুক্তির পাঞ্চজন্য নির্ঘোষিত তোমার কণ্ঠে :
অশিক্ষা থেকে, বুভুক্ষা থেকে, সংস্কার থেকে—সবরকম মুক্তি
পরিপূর্ণ মানবাত্মার উদ্বোধন,—এই তো তোমার ঘোষণা ।
শুনিনি কোনো দিন কোনো সন্ন্যাসী কেঁদে ওঠে মৃত্যুর শেষ মুহূর্তেও
অন্নপানহীন, অসহায় দেশবাসীর জন্যে ;—
পরের ব্যথাকে আপনার করে নিতে এমন একান্ত করে,—
"ছাখ তো হৃদে আমার পিঠে চড় মারলো কে ?"—
"ইস্ পাঁচটা আঙুলই যে বসে গ্যাছে মামু"—
গঙ্গার ধারে দুই মাল্লা ঝগড়া করছিল অশান্ত হয়ে
একে অপরের পিঠে বসিয়ে দিয়েছিল এক চড়—
তারই আঘাত তীব্র হয়ে লেগেছে এই মানুষটির গায়ে ।

মনের কত গভীরে পাতা হলে অনুভূতির আসন
সম্ভব হয় এমন,—ব্যাখ্যা করবে কোন মনস্তাত্ত্বিক ?
মানুষকে মূঢ় বলে দম্ভের মুগুর ভাঁজা নয়,—
"নরকস্য দ্বারং নারী"—বলে বিকৃত ধর্মব্যাখ্যা নয়—
তুড়ি মেরে বুদ্ধির কাঠিতে নেতিবাদের বাজিখেলা নয়।
পথের বিঘ্ন নয়, জীবন সাধনার সঙ্গিনী আজ নারী।
এ অবতারে দেবতা নেই, আছে মানব—
স্বর্গের প্রলোভন, মুক্তির মোহ নেই—আছে এই ধূলি মলিন পৃথিবী।
মুখের ফাঁকা বুলি নেই, প্রমাণিত জীবন-চর্যায়।
এই পৃথিবী ছেড়ে ভগবান নেই কোথাও—
"জীবে প্রেম করে সেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"
মানুষকে দূরে রেখে যারা পাথর ধরে কাঁদে
মানুষের ছায়া বাঁচিয়ে মন্দিরে ঢোকে যারা মানুষের রক্ত-অর্ঘ্যে
সেই মিথ্যাচারী অপবিত্রেরাই ভিড় করে আছে তোমার দুয়ারে।
শঙ্খ আবার বাজাও তুমি ওদের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে
কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত হোক সেই প্রাণমন্ত্র :
"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যবরান্ নিবোধত"—
মুক্তির পথ এখনো অ...নে....ক দূরে।

দেখব না দেখতে পারব না!

ওর কালো রেশম চুলে আগুন লাগিয়ে দিল কারা—
আমি দেখলাম, পুড়ে ছাই হয়ে গেল।
স্তূপীকৃত কাষ্ঠের তলায় চাপা পড়েছে ওর পুষ্প-দেহটি—
আমার কত রাতের উষ্ণ স্পর্শ,
বাসনার পঙ্ক-প্রদীপে উজ্জ্বল হয়ে আছে আজও।
ওর বিকৃত মুখের চারপাশে
আগুন জ্বলছে দাউ দাউ করে,—ধোঁয়া উঠছে কুণ্ডলী পাকিয়ে।
একটা পাশ ঝলসে গেছে একেবারে,
লাল টুকটুকে ঠোঁট দুটি গেছে সাদা—একেবারে সাদা হয়ে
উঃ! কী ভীষণ—বীভৎস সাদা!
আগুনটা কে খুঁচিয়ে দিল ওপাশ থেকে।
নরম তুলতুলে গালটা গেছে একেবারে পুড়ে
বেরিয়ে পড়েছে একপাটি দাঁত।
চুড়ি বাঁধা নিটোল শুভ্র হাতখানি তখনো অক্ষত ···
ও হাতের মিষ্টি আদর আজো আমার কপালে।

না, না! আর আমি দেখব না—দেখতে পারব না।
অপলক দৃষ্টিতে চেয়েছিলাম এতক্ষণ
চোখ আমার আপনা থেকে বুজে আসে এক সময়···।
তারপর! তারপর আর মনে নেই—জানিনে কিছুই।
সবাই বলে পাগল হয়ে গেছি নাকি আমি সেই থেকে—
পাগল কিন্তু আমি হইনি মোটেই,—ওদের ভুল!
পাগল হলে কি কেউ কবিতা লেখে?

রূপকথা

(কথার ফিতে)

এ নীল মাটিতে কবে ফুটেছিল একদিন লাল টুকটুকে এক ফুল
তরল হীরক রোদে হাল্‌কা হাওয়ায় হাসে নৃত্যের ছন্দে দোদুল।
গন্ধের শ্বেত পা'রা উড়ে যায় কোথা যায় বর্ণের সুরেলা সানাই,—
স্বপ্নের দেশে এক কাজলকুমার জাগে—চোখে তার ঘুম নাই নাই।
কার যেন হাতছানি, একটি মিষ্টিমুখ—হৃদয়-ঝুলনে দেয় দোল।
ফুল-কুমারীরও তাই গুণ্ঠন খোলো খোলো কেঁপে ওঠে নীল-নিচোল।

সমুদ্র উতরোল উদ্বেল তাই :
ঊর্মির হাত তুলি উঠিতেছে ফুলি ফুলি
কারে যেন চাই তার চাই।
চুম্বন উদ্যত ভেঙে পড়ে অবিরত
তন্দ-নীল ছায়াটি কাহার!
একটুকু ছোঁয়া দিয়ে চলে যায় দোলা দিয়ে
বুকে ফোঁসে ব্যথার পাহাড়।
কোন্ সে অপরাজিতা কোন দূর পারমিতা
নীল শাড়ী দুচোখ ভুলায়!
নীল-নদে নাও বেয়ে বিরহের গান গেয়ে
দূত-পবনেরা যায় যায়।
অবশেষে একদিন রূপকন্যারও বুঝি কেঁপে ওঠে সাতনরী হার রে,
না পাওয়ার ক্রন্দন আনে বুঝি বন্ধন খুলে যায় দিগন্ত দ্বার রে।
সেখানেই ধরা দেয় নীল মেয়ে কথা কয় দিগ্‌বধূ বুঝি তার সাক্ষী.
তাদেরই মিলন-দীপ সন্ধ্যা সকালে জ্বলে ;—উড়িতেছে তারই
লাল ফাগ কি!!

তাই বুঝি তাই হবে তাই রে
বঁধূ তার বুকে আজ নাই লাজ নাই ভয় নাই রে।

দামাল সাগর তাই অশান্ত আর নাই দূর-দ্বীপা বাসর তাহার।
নরম ঢেউয়ের ফুলে ফেনায় পাপড়ি দোলে—সৃষ্টির শুভ্র কুমার॥

সে এক ঘুমের দেশে পাষাণপুরীর তলে কুমারী পৃথিবী ঘুমঘুম—
ঘুমের কাজলে তার তবু কে মাখায়ে যায় সবুজ আলোর কুমকুম।
পাণ্ডু আঁচল তার শিহরি শিহরি ওঠে কার যেন স্বপ্নের সুর—,
(আর) তেপান্তরের পারে নীলার প্রাসাদে বাজে ছন্দময় নরম নূপুর। ..
কত দেশ ঘুরে ঘুরে সপ্তাশ্বের খুরে
ধূলি ওড়ে উদ্দাম চঞ্চল—
পথ ভেঙে মাঠ ভেঙে সাগর পাহাড় ভেঙে
একদিন কম্পিত ঝলমল
রক্তিম রথ তার তোরণ দুয়ারে এসে বিজয়ী বীরের বেশে থামল।
অস্থির বিস্ময়ে আলোর আঙুল তুলি শিয়রে সোনার কাঠি রাখল॥
সচকিত কুমারীর কালো আঁখি-পল্লবে আনন্দ লজ্জার ঝর্ণা!
যে ছিল স্বপ্নে ছেয়ে তারি তো উষ্ণ ছোঁয়া! অনুরাগে হল ঋতুপর্ণা।
তারপর থেকে বুঝি সৃষ্টি বাসর জাগে পৃথিবী ও সূর্য প্রেমিক—
সোনায় শ্যামলে ভরা মুঠো মুঠো অঞ্জলি পূর্ণ করিছে দশদিক।

রূপোলী পক্ষিরাজে হে রাজকুমার এস নেমে এস আমাদের দেশে।
হে রূপ-কুমারী জাগো, কাজল-কুমার জাগো, জাগো আজ বর-বধূ বেশে॥
ফুলের মতন হও, আকাশ সাগর হও ধরিত্রী সূর্যের মত।
তোমার ও মহান প্রেম মুক্তির পাখা মেলে পার হোক জীবনের যত
ক্ষুদ্রতা ক্ষত সব;—গ্লানি আর কুশ্রীতা যুগান্ত সঞ্চিত জঞ্জাল।
এ বিবাহ বহিবে না আপনারে শুধু নাও হে প্রেমিক প্রাণের মশাল!
তোমরা সৃষ্টি কর নব-জাতকের বুকে পৃথিবীর নতুন শপথ,
ধর এ রক্তরশ্মি নির্ভীক পদাতিক টান মার আগামীর রথ।
তোমাদের দুটি দেহে একটি মুক্ত-প্রাণ—ভেঙে ফেল প্রাচীন দেয়াল।
বন্ধ্যা ব্যথিত বুকে প্রাচুর্য-পূর্ণতা,—নিয়ে এস নতুন সকাল॥

তিনটি উটের কাহিনী

ওরা জানে না কাদের বোঝা বহন করে চলেছে দিনরাত
সীমাহীন এই আগুনের সমুদ্র বেয়ে।—
জন্ম থেকেই পিঠে কেন এই গুরুভার বোঝা?
আদি পৃথিবীর কুৎসিততম নিরীহ প্রাণী,—
অসমাপ্ত, অপূর্ণ, বিকলাঙ্গ কুঁজ ওঠানো লম্বা গলা এই উট—
দগ্ধ মরুভূর ক্ষীণপ্রাণ জন্ম-বুভুক্ষু জীব।
নিষ্ঠুর বিধাতার অবহেলায় বুঝি এদের জন্ম।
অদ্ভুত বিকৃত এর গড়ন প্রাণস্পন্দন আছে তবু এর বুকে
শিরায় শিরায় আছে উষ্ণ লাল রক্তের প্রবাহ,
আছে সুখ দুঃখ ক্ষুধা তৃষ্ণার বোধ—ঠিক তোমাদেরি মত।

উত্তপ্ত বালু-সমুদ্রে একমাত্র আদিম জলযান
একবার খালি করে, আবার বোঝাই হয় নতুন বোঝার ভারে,—
জন্মগত দাসত্বের অনুরাগী বোঝা
ক্লান্তিহীন যন্ত্র জীব
দিকদিকে পায়ে শ্রান্ত মন্থর গতি
বড় বড় চোখে নামে বিফল হতাশা;
রক্তাক্ত সূর্যের দিকে মুখ তুলে চেয়ে তারা একনাগাড়ে পথ চলে;
মরুভূর উত্তপ্ত বাতাসে
সূর্যের শাণিত বর্শাগুলি সাঁই সাঁই করে চলেছে,—
লোম-ওঠা হাড়-বের-করা পাঁজরের ভিতর দিয়ে
ঝকঝকে ধারালো ফলাগুলি
এলোপাতাড়ি বার বার বেরিয়ে যায় হু হু করে।
অসহ্য যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে ওঠে প্রাণ
একটা অস্পষ্ট বিকৃত শব্দে তার করুণ আত্মপ্রকাশ!

এক গুচ্ছ কাটা ঘাস নিমন্ত্রণ জানায় পথের পাশ থেকে —
ছুটে যায় আকুল আগ্রহে,— চিবোতে থাকে তন্ময় হয়ে,
মুখ-মাড়ি থেঁত্‌লে যায়, ক্ষতবিক্ষত হয় কাঁটার অঙ্কুশে
রক্তের ঝরণা উথলে ওঠে সারা মুখে—
শুষ্ক জিভে লেহন করে তাই সুগভীর পরিতৃপ্তিতে।
সর্বনাশা অনির্বাণ মরুতৃষা!

ওদিকে হঠাৎ সোঁ সোঁ শব্দ ওঠে দূর দিগন্ত থেকে :
মরুর পাগলা দেওটা ক্ষেপেছে—ঝড় এসেছে, বালুর ঝড়।
প্রখর ওদের অনুভূতি ; মুহূর্তেই মুখ গুঁজে
বালুর মধ্যে শুয়ে পড়ে একে একে সবাই—সারি সারি।
ক্ষুধার্ত উটটা কিন্তু কাটা ঘাস চিবিয়ে চলেছে তখনো—
ক্ষুধার নেশায় খেয়াল হয়নি কিছুই।....
হু হু করে চক্ষের এসে পড়েছে ঝড় :
যেন আগুন লেগেছে,—রক্তাক্ত হয়ে গেছে সারা আকাশ —
আছড়ে আছড়ে ওকে উড়িয়ে নিয়ে গেল কোথায়!
কয়েকবার ছট্‌ফট করল হাত-পা,—আর দেখা গেল না!!
কোন বালুর স্তূপে চাপা পড়ল ওর তরুণ দেহটা
ক্ষুধা তৃষ্ণার ঘটল পরম নির্বাণ।
জন্ম থেকেই বালুর সমুদ্রে যাত্রা যার সুরু—
তপ্ত বালুতেই রচিত হল তার সার্থক সমাধি।
ঝাপ্‌টার পর ঝাপ্‌টা এল বিকট গর্জন করে........
কতক্ষণ ধরে চলল এই তাণ্ডব-নৃত্য :—
বালুর সমুদ্রে ঢেউয়ের ওঠা-পড়া আর হু হু আর্তনাদ ......
—এক সময় শান্ত হয়ে যায় ঝড়।

উটগুলো উঠে দাঁড়ায়,—যাত্রা করে আবার।
বিশ্রামের মানে নেই বুঝি এদের জীবনের ইতিবৃত্তে,—

রক্ত-সমুদ্রের বুকে যেন পাল-তোলা নৌকোগুলো—
দুলে দুলে চলেছে·····।
কিছু দূর এগিয়ে যেতেই মুখ থুবড়ে পড়ে আর একটা উট :
পেছনের পা-দুটো কাঁপতে থাকে থর থর করে,—
সামনের পা-দুটো ভেঙে পড়ে অসহায়ের মত,
ভুকম বেয়ে গড়িয়ে পড়ে কয়েক ঝলক লাল তাজা রক্ত।
বড় বড় চোখে ঘনিয়ে আসে মৃত্যুর সীমাহীন অন্ধকার—
তারপর সব শেষ ; সেই চিরন্তন পথ !!
দাসত্বের জন্মগত বোঝা পিঠ থেকে নামে সেই দিনই
অনন্ত বিশ্রাম নিয়ে নেমে আসে যেদিন মৃত্যু। ..
বালুশয্যায় পড়ে থাকে মৃত দেহটা !·· ······

উটের দল আবার এগিয়ে চলে ক্লান্ত কম্পিত পায়ে—
আকাশে রক্তাক্ত সূর্য আগুন ছড়ায় সহস্র হাতে
ঝকমক করে জ্বলতে থাকে সীমাহীন বালুর সাগর।
পথ কোথায় ?
প্রতিবাদহীন এমনি বহন করা দাসত্বের বোঝা
আর মরুভূর মধ্য পথে মুখ থুবড়ে পড়ে মরা ?

সূর্য-শিশু

"There is need for a screeching sweated realism - and the Sun teaches it everyday."--

তুমি তো সূর্যের শিশু পৃথিবীর প্রথম কুমার—
একী রূপ হয়েছে তোমার ?

শীর্ণক্লান্ত ম্লান দেহ ন্যুব্জ পৃষ্ঠে শতাব্দীর দাসত্বের বোঝা !
বিশাল বৃক্ষের মত একদিন ছিলে খাড়া সোজা
সবারে দিয়েছ ছায়া ; সভ্যতার আদিম সম্রাট।

সবুজ সাম্রাজ্য স্নিগ্ধ আদিগন্ত শস্য-ভরা মাঠ—
সমুদ্রের মত ছিলে উদ্দাম প্রবল !

হে আত্মবিস্মৃত বন্ধু ! ইতিবৃত্ত ফেলে অশ্রুজল
ছলোছল মৌন চোখে চায়,
দিনে দিনে দিন যায় উড়ে যায় সময়ের দ্বিধাহীন নীলাভ্র পাখায়।

পথ কুক্কুরের মত
অন্নদাতা, অন্নরিক্ত বহিতেছে ছিন্ন ঝুলি মুষ্টি-ভিক্ষা ভার।
প্রস্তর-প্রমত্ত তপ্ত কৃষ্ণকান্ত হে সুন্দর শিবের সন্ততি !
বিলুপ্ত কি সেই জয় জ্যোতি ?

আজো তো তোমার হাতে স্বর্ণোদ্গারি লাঙলের ফাল
সবুজ শিশিরে কাঁপে হীরক সকাল।

মেদুর মদির মাটি সারাদিন সৃষ্টিমগ্ন সূর্যের বাসরে—
সবুজ সোনালী দ্বীপ দুই হাতে চলেছে সে গড়ে'।

আকাশ-অমৃত ধারে সূর্য আজো মুক্ত হাতে করাইছে স্নান,—
তা হলে এ মৃত্যু কেন ভীরুতার বিষণ্ণ শ্মশান ?

এ সূর্য কি নিঃশেষিত তুলসীমঞ্চে টিমটিমে সন্ধ্যার প্রদীপে,
উলঙ্গ শীতের রাতে ক'টি পাতা জ্বলে যাবে নিভে ?

সূর্যের মাটির স্নেহে স্নায়ু-স্রোতে বেড়ে-ওঠা মজবুত ঘাড়
        সে কি শুধু লোভের গহ্বরে
নিজেরে বঞ্চিত করি তুলে দিতে আপন মাঠের অন্নভার ?
        এ সূর্য কি আনিবে না নীল রক্তে শাণিত জোয়ার
                                        কাটিবে না ক্লান্ত মেঘভার ?
        এ সূর্য -রক্তাক্ত সূর্য ব্যর্থ হবে তবে ?
                                        ঘূর্ণাবর্ত আনিবে না,
নির্বাপিত দেহ-চুল্লি পিষ্ট-পেশী জাগিবে না কলকল রবে !

বোম্বাই গরুর গাড়ী নিয়ত অদৃশ্য হয় গুপ্ত এক বৃত্ত পথ ধরে,
অদৃষ্ট-জুয়াড়ী যত শূন্য হাতে ; অশ্রুজল ঝরে
এ সূর্য কি শান্ত হবে,-- রুক্ষ চোখে লোনা জল এনে
দিন যাবে ধান ভেনে, শ্রান্ত ঘাড়ে গরুর গাড়ীর বোঝা টেনে ? -
ভাঙিবে না হিংস্র এক সমুদ্র সংবাদে,
নিরুপায় যুক্ত হাত গরজি উঠিবে না কি দৃঢ় এক মুষ্টিবদ্ধ হাতে ?
এ সূর্য কি শেষ হবে নিশীথের ক্ষণিক উল্লাসে
        ক্ষীণ বক্র মেরুদণ্ডে শুধুমাত্র বিকৃতির বীভৎস বিলাসে ?
                —অসহায় জরায়ুর বাড়াবে গঞ্জনা—
বিকলাঙ্গ অপমৃত কতগুলো অপূর্ণ জীবের সম্ভাবনা !
জীর্ণ এ গরুর পাল তৃণহীন রিক্ত মাঠে নিয়ে যাবে আর কতকাল
        হে রুগ্ন রাখাল !   হয়েছে সকাল !
নতুন প্রভাতরৌদ্রে একবার চেয়ে দেখ আপনার বিস্মৃত চেহারা
        রুদ্ধ-পথে মাঠে মাঠে বসাও পাহারা।
এ সূর্য কি ছড়াবে না রক্তে রক্তে জ্বলন্ত আগুন -
সুপ্তশস্য হাত-জাগা ভীষণের ভস্মমাখা রোষদীপ্ত রক্ত-স্নাত তূণ ?
হে আত্মবিস্মৃত বন্ধু ! হে সূর্য-শিশুরা !!
    নির্ভয়ে আকাশে তোল অগ্নিদগ্ধ অতীতের কুণ্ঠাহীন সূর্যমুখী চূড়া।

দুরন্ত পঁচিশ

"To strive, to seek, to find, and not to yield."

যৌবন সোনালী স্বপ্নে মনে হয় আমি যেন প্রথম মানুষ

স্বর্গের আনন্দ ছবি এইমাত্র দেখেছি চাক্ষুষ।

আমার উজ্জ্বল চোখে এখনো যে পারিজাত মন্দারের মায়া,

কুলুকুলু মন্দাকিনী মুগ্ধ বক্ষে ফেলিতেছে ছায়া, —

সে ছায়ার মধু কলধ্বনি

আমার সর্বাঙ্গব্যাপী রক্তে রক্তে রিনিঝিনি ওঠে রণরণি।

ওরা বলে এ কল্পনা পঁচিশের আগে

সকলেরই থাকে,—

তারপর একদিন কখন যে উবে যায়, দূরে যায় শূন্য করি সব

কোটাল বানের মত,

শ্রাবণ বর্ষণক্লান্ত নিঃশেষিত আকাশের মতই নীরব।

সবার হলেও জানি আমার হবে না।

আমার পঁচিশ কভু বন্ধ্যা হয়ে রিক্ত সে রবে না।

আমার তো কিছু নেই বিত্ত না বীরত্ব নেই মোর

কর্মের তপস্যা দানে অন্ধ রাত্রি করিব যে ভোর,—

স্বার্থের গুহায় আমি হানা দেব ; হয়ে রূঢ় দুরন্ত সৈনিক

সংগ্রামে নিঃশঙ্ক চিত্তে হব যে নির্ভীক—

সে আমার কাজ নয়—জেনেছি তা প্রথম প্রভাতে।

একটি উর্বর জমি আছে মোর হাতে

সেখানে বুনেছি আমি অঙ্কুরিত বীজ পাকা পাকা

প্রত্যাহেরে বিদ্ধ করি অনাগত ইতিহাসে মেলিবে সে সপ্তাশ্বের পাখা।

আমার চেতনা সাথে সমপ্রাণ মানুষের বেদনার্ত কল্যাণ-চেতনা

আমার অঙ্কুর-বীজে যৌব-স্বপ্ন র'বে কলস্বনা।

অক্ষরের পদাতিক অনন্ত সেনানী

আহত যুগের কণ্ঠে শোনাইবে উজ্জীবনী বাণী,—

দেশে দেশে অগণিত পঁচিশের স্পন্দিত পাঁজরে

এ অমাবস্যার পথে সূর্যের স্বাগত-স্বপ্ন বিলাইবে মুঠো মুঠো ভরে।

দম্ভের দুর্গের দ্বারে স্তূপীকৃত স্বর্ণের জঞ্জাল

মুক্ত ভিন্ন করে দেবে ; আনিবেই আনন্দিত বশিষ্ঠ সকাল

সপ্তাশ্বের শাণিত সোপানে।

অবক্ষত এ পঁচিশ তারি গান গেয়ে যায়---তারি মন্ত্র দিয়ে যায়

লক্ষ লক্ষ পদাতিক পঁচিশের কানে।

আপাতত দুই হাতে বুনে যাই ছোট্ট মোর ক্ষেতে

পঁচিশের স্বপ্ন-বীজ মৃত্যু-পথে [illegible] ত গেছে—

আগা[illegible] [illegible]রাণ প্রাণের ফসল--

আমার যৌবন-অর্ঘ্যে সহস্র যৌবন হবে প্রাণারক্ত অশোক উজ্জ্বল।

কলমের কোদাল চালিয়ে

বারে বারে এ মাটিরে সোনা-স্বপ্নে রেখেছি জ্বালিয়ে।

পঁচিশের পূত স্বপ্নে মননের সোনা ধান বুনি

এ মৌক্তিক জীবনের---সিন্ধু-সুপ্ত ঝলসিত হীরে পান্না চুনি।

আমার পঁচিশে-স্বপ্ন যাবে না তা উড়ে

নিত্য নব প্রাণাঙ্কুর শ্যামস্বপ্নে উঠিবে সে রুক্ষ মাটি ফুঁড়ে।

পঁচিশের সোনা-ভরা মননের মাঠে

আমার কলম-কাস্তে রাশি রাশি সোনা-ধান কাটে ;---

সে ধানেতে একমাত্র আছে অধিকার,

যুগান্তের কুরুক্ষেত্রে শিবিরে শিবিরে যত নির্ভীক সেনার।

———

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠাঙ্ক	লাইন সংখ্যা (উপর থেকে)	ভুল	শুদ্ধ
৪	৪	ভুমিকা	ভূমিকা
৬	১১	ব্যাবলিন	ব্যাবিলন
ঐ	১২	মথধে	মগধে
ঐ	২৪	ঝাঁপিয়ে	ঝাঁপায়ে
৮	১৮	ভুম	ভূমি
৩৭	৭	বনে	বনের
৪০	১	অসীমে	অসীম
৪১	৪	বাক্তী	বাক্তি
৬২	৬	পূর্বারাগ	পূর্বরাগ
৭৪	১৬	অদ্ভুত	অদ্ভুত
৮৯	৮	যাবে	পাবে
৯৬	৩	ধাত্র	ধাত্রী
৯৯	১৩	অর্ঘ্য	অর্ঘ্য
৩৭, ৭২, ৭৮, ৮৩	১১, ২, ১১, ৩	ব্যাভিচার	ব্যভিচার
	(যথাক্রমে)		